আজব দেশের চমক

মোহিত রায়

আজব দেশের চমক

মোহিত রায়

প্রশ্ন প্রকাশন

আটের সি টেমার লেন

কলিকাতা সাতলক্ষ নয়

প্রকাশক ঃ
স্বত্ব ঃ মরমী রায়
মধুসূদন ব্যানার্জী
প্রশ্ন প্রকাশন
৮ সি টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৬ ফেব্রুয়ারী
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা ঃ অভিমন্যু দাস

মূল্য ঃ দশ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
ইন্দ্রলেখা প্রেস
পরেশনাথ পান
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান ঃ
ইস্টার্ণ বুক এজেন্সি
৮সি, টেমার লেন
কালকাতা-৭০০ ০০৯

আমার কথা

ছোটরা জানতে চায়। জেনে পায় আনন্দ, শিক্ষা আর প্রেরণা। ছোটদের কাছে তুলে ধরছি—আজব দেশের বিস্ময়ের বিবরণ আর বিচিত্র জীবজন্তু ও মানুষের কথা। আজব দেশের কথা জানলে ছোটদের মনে জাগবে অভিযানের রোমাঞ্চ।

ছোটদের নানা পত্রিকায় আমার লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, এবারে দুই মলাটের মাঝখানে তাদের ধরে রাখছি।

মোহিত রায়

'খেয়া'

গেটরোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সূচীপত্র



যে দেশে মানুষ মরে হাসতে হাসতে

অস্ট্রেলিয়ার ঠিক মাথার উপরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি দ্বীপ—পাপুয়া নিউগিনি। এখানকার বনাঞ্চলে বাস করে আদিম উপজাতি মানুষেরা। হাসতে হাসতে তাদের মৃত্যু ঘটে।

সমুদ্রে-ঘেরা দ্বীপ পাপুয়া নিউগিনি পাহাড়-জঙ্গল আর নদীনালায় ভরা। এখানকার একদিকের বনাঞ্চল দুর্গম। ঘন বনের ভিতর দিনের আলো যায় না। এই বনের অধিবাসী উপজাতিরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বিষের তীর আর বর্শায়। বন্য ও গৃহপালিত পশু-পাখির সংখ্যা নেই বললেই চলে। শস্যাদিও বিশেষ হয় না। সেখানে খাদ্যের খুব অভাব। ফলে উপজাতিরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে যারা হেরে যায় তাদের মাংস খায়। ভাবতে ব্যাপারটা অবাক লাগে। কিন্তু আজগুবি নয়—আজব দুনিয়ায় মানুষে মানুষ খায়।

তারা ভূত-প্রেত আর ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করে। নিজেদের মধ্যে লড়াই হবার পর যারা জয়ী হয়—তারা নাচগান আনন্দ উৎসবের

আয়োজন করে। এই উৎসবেই তারা যারা হেরে যায়—তাদের মাংস খায়।

মানুষের মাংস খাওয়ার ফলে তাদের এক ধরণের বিচিত্র রোগ দেখা দেয়। অদ্ভূত রোগ—রোগী হাসতে থাকে আর হাসতে হাসতেই তারা প্রাণ হারায়।

এই উপজাতিরা যাতে মানুষের মাংস না খায়—তারজন্য চেষ্টা চলেছে। মানুষের মাংসের বদলে গবাদি পশুর মাংস যাতে তারা খায়—সে কারণে তাদের বনে পাঠানো হয়ে থাকে প্রচুর পরিমাণে গরু-ছাগল-ভেড়া।

———



নীল শিয়ালের গল্প কে না জানে! কিন্তু নীল মানুষের কথা? মানুষের গায়ের রঙ ফরসা, ময়লা বা তামাটে বলেই আমরা জানি। কিন্তু আজগুবি নয়, আজব ছুনিয়ায় এমন মানুষও আছে—যাদের গায়ের রঙ নীল।

আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা মরুভূমি। এখানকার মরুস্থানে বাস করে বেছুইন বাগুইবাট পাহাড়ী যাযাবর উপজাতি—তারাই নীল মানুষ। হারিয়ে যাওয়া মহাদেশ আটলানটিসের শেষ অধিবাসী বলে নীল মানুষদের অনেকে মনে করেন।

বিচিত্র তাদের জীবন। কিন্তু তাদের গায়ের রঙ নীল কেন? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও মেলেনি। তবে কারণ অনেকে অনুমান করেন। ছোটবেলা থেকেই নীলমানুষেরা আলখাল্লা ধরণের ঢিলা পোশাক পরে। এই পোশাক গাঢ় নীল রঙের। এই পোশাক তাদের গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে মিশে থাকে। পোশাকের নীল রঙ তাদের চামড়ার সঙ্গে মিশে যায়। তার ফলেই নাকি তাদের গায়ে রঙ হয় নীল। তাদের মেয়েরা মুখে নীল উলকি কাটে।

মজার ব্যাপার হল—তাদের ছেলেরা পর্দানশিন, মেয়েরা নয়। তাদের পারিবারিক সব কিছুর উত্তরাধিকার পায় মেয়েরা। মেয়েদের সামনে ছেলেরা ধূমপান করে না, মদ খায় না, জোরে কথা বলে না, মাথা নিচু করে থাকে। এক কথায় সেখানে মেয়েদেরই রাজত্ব।

কিন্তু ছেলেরা মেয়েদের বাধ্য হলেও দুর্বল নয়, ছেলেরা দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক। সারা সাহারা অঞ্চলে তারা ত্রাস বিভীষিকা সৃষ্টি করে রেখেছে। আফ্রিকার কালো মানুষেরা নীল মানুষদের ভয়ের চোখে দেখে। নীলমানুষেরা নৃশংসভাবে লুঠতরাজ করে, মানুষকে খুন করতে তাদের এতটুকু দ্বিধা নেই। আর করে চোরাকারবার। গবাদি গৃহপালিত পশুও তাদের আছে, সেগুলিও বেচাকেনা করে। প্রত্যেক পরিবার গড়ে দশ-পনেরটি করে গরু পোষে। তাদের অনেকের লবনের ব্যবসাও আছে।

মরক্কো আর আলজিরিয়ার দক্ষিণে তিন লক্ষ এবং মালিতে দুই লক্ষ নীল মানুষ বাস করে।

নীল মানুষদের হাতে এখন বন্দুক আর পাইপগান এসে গেছে। এছাড়া ধারালো অস্ত্র তো আছেই। আর আছে বিষ মাখানো তীর। উটের পিঠে তারা চড়ে বেড়ায়।

একবার মালি রাজ্যের সরকার তাদের গবাদি পশুর উপর কর ধার্য করেছিল। কর আর আদায় হয় না।

মালি সরকার একদল কর্মচারী পাঠালেন নীল মানুষদের কাছে কর আদায় করতে। কিন্তু তারা কেউ আর ফিরে আসে নি, সকলেই নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়েছে নীল মানুষদের হাতে। ফলে মালি সরকার নীল মানুষদের উপর চালায় সামরিক অভিযান। নীল মানুষেরা

পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে গেরিলা কায়দায় মালির সামরিক শিবিরগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে নাজেহাল করে তুলল। বাধ্য হয়েই মালি সরকারকে পিছিয়ে আসতে হল, ব্যর্থ হল নীলমানুষদের বিরুদ্ধে আধুনিক সামরিক অভিযান।

নীলমানুষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হল আফ্রিকার আর এক দুর্ধর্ষ উপজাতি টাডজিকেনট। তাদের সঙ্গে প্রায়ই নীলমানুষদের লড়াই হয়। নীল মানুষেরা হেরেও যায় মাঝে মাঝে।

মরক্কোর শহরে-বন্দরে নীলমানুষদের দেখা যায়। নীল মানুষেরা মরক্কোর মরুদ্যান উপশহর জাগোবা আর গুলিমাইনেও বাস করে।

নীল মানুষদের উৎসব হল—গুয়েদ্রা। প্রতি শনিবার রাত্রে নীল মানুষেরা মেতে ওঠে উৎসবে। গুয়েদ্রা হল নীলমানুষদের নির্দিষ্ট এলাকার সকলের মিলিত নাচগানের বিরাট অনুষ্ঠান। তার আগে তারা সকলে মিলে করে পানভোজন। তারপর বেজে ওঠে মাদল, শুরু হয় সকলের উদ্দাম নৃত্য, সঙ্গে তাদের অস্পষ্ট বা অনুচ্চ স্বরের গান—মনে হয় তারা যেন বিড়বিড় করে কথা বলছে। কারণ, তাদের গানে সুর নেই। গুয়েদ্রা উৎসবও পরিচালনা করে মেয়েরা। আজব দুনিয়ার চমক—নীল মানুষ আর তাদের গুয়েদ্রা উৎসবও হল বেশ মজার।

———

যে দেশ প্রবালকীটে গড়া



অনেকের হাতের আঙ্গুলের আংটিতে প্রবাল পাথর দেখা যায়। লাল, নীল, সাদা, কালো ও হলুদ—নানারঙের প্রবাল হয়। লাল রঙের প্রবালকে বলে রক্ত-প্রবাল, তার খুব দাম। জ্যোতিষীরা প্রবাল পাথর আঙ্গুলের আংটিতে আর গলার মালায় ধারণ করতে বলেন।

আসলে প্রবাল হল এক ধরণের সামুদ্রিক প্রাণী বা কীট। চলতি কথায় আমরা যাকে বলি পোকা। প্রবাল হল কীটজ পাথর। প্রবাল কীটের বাইরের ত্বক্ থেকে ক্ষরিত আঠাল রস সমুদ্রের চুনের সঙ্গে মিশে কীটের দেহের চারদিকে কঠিন আবরণের সৃষ্টি করে। এইগুলি কালে জমে পাথরের মতো কঠিন হয়, পরিণত হয় প্রবালে। সমুদ্র যেখানে গভীর নয়, তাপও সেখানে কম—সেখানে প্রবাল জন্মায়। মজার ব্যাপার হল যে সমুদ্রের তলাতেই কোটি কোটি প্রবাল কীটের জন্ম, বৃদ্ধি, চুনক্ষরণ ও মৃত্যু হয়। রাশি রাশি প্রবাল মরে এক জায়গায় জমতে থাকে। জমতে জমতে সমুদ্র ভরাট হয়, সেখানে ভূমি উঁচু হয়ে ওঠে। অনেকদিন পর সেখানে হয় চুনা পাথরের পাহাড়। এই ভূগঠনকে বলে প্রবালদ্বীপ।

প্রবালদ্বীপ সমুদ্র থেকে সামান্য জেগে ওঠে, মাত্র কয়েক হাত। সমুদ্রের ঢেউতে গাছপালার বীজ ভেসে আসে সেখানে, পাখিরাও বীজ মুখে করে নিয়ে আসে। কিছুদিন পর, সেখানে গাছপালা জন্মায়। পরে জনবসতি হয়। ছোট জায়গা, তাই বাসও করে খুব কম লোক।

তিন রকমের প্রবাল দ্বীপ আছে। সমুদ্রের তটের সঙ্গে যুক্ত দ্বীপ। এখানকার জলও খুব বেশি নয়। ভারতের নিকোবর ও সেতুবন্ধ-রামেশ্বরম্ এবং শ্রীলঙ্কা ও মরিসাস দ্বীপের কাছে এই ধরণের প্রবালদ্বীপ আছে। তাকে বলে বেলা শৈল প্রবালদ্বীপ। আর এক ধরণের প্রবাল-দ্বীপ হল প্রাচীরের আকৃতি। এখানে সমুদ্রের জল বেশি। তাকে বলে প্রাচীর প্রবালদ্বীপ। অস্ট্রেলিয়ার কাছে এমন প্রবালদ্বীপ আছে। আবার, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আছে গোলাকার বা ঘোড়ার পায়ে লাগালো ক্ষুরের আকারের প্রবালদ্বীপ। এই দ্বীপ ভূভাগ থেকে অনেক দূরে মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রবালদ্বীপের মধ্যে থাকে হ্রদ। এই প্রবালদ্বীপকে বলে বলয় প্রবাল দ্বীপ।

প্রবাল কীট অনেক জাতের। জীববিজ্ঞানীদের মতে আড়াই থেকে পাঁচ হাজার জাতের প্রবাল কীট আছে। প্রবালদ্বীপ আকারে ছোট হয়। প্রবালদ্বীপে দেখা যায় সারি সারি নারিকেল আর তাল গাছ।

প্রবালদ্বীপে পাকা ঘরবাড়ি নেই। মানুষ কুঁড়েঘর বানিয়ে বাস করে। প্রবালদ্বীপে প্রচুর নারিকেল জন্মায়। এখানকার মানুষেরা নারিকেলের ও তার ছোবরার কারবার করে। আরও পাওয়া যায় — সামুদ্রিক নানা ধরণের মাছ। দ্বীপের অধিবাসী পুরুষেরা মাছ ধরে। নৌকা নিয়ে সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ায় মাছ ধরবার জন্য। তাদের

নৌকার গঠনও বিচিত্র। সমুদ্রের ঢেউতে যাতে নৌকা উলটিয়ে ডুবে না যায়, তার জন্য তারা নৌকার দুপাশে বেঁধে রাখে দু:টা ভারি লম্বা কাঠের গুঁড়ি। নিজেরাই নৌকা, দাঁড় ও বৈঠা তৈরি করে।

প্রবালদ্বীপে বনজঙ্গল নেই, তাই নেই বন্য জীবজন্তুও। তবে গাছ গাছাগুলিতে আছে রঙবেরঙের পাখি-প্রজাপতি-পতঙ্গ।

দ্বীপের উঁচু ঢিপির উপর দ্বীপবাসীদের বসবাসের কুঁড়েঘর। চাল তালপাতায় ছাওয়া। ঢালু চাল, বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ে নিচে। ঘরের দেওয়াল বাঁশের কাঠামোয় কাঠের পাতলা তক্তা আঁটা। বেশ মজবুত। তারা তালপাতায় বুনে সুন্দর মাদুর ও চাটাই তৈরি করে। এই চাটাই হল তাদের বসবার জায়গা।

তাদের বাসন-কোসন নেই। নারিকেলের মালাই হল তাদের বাসন-কোসন।

প্রবালদ্বীপ—বিশাল নীল সমুদ্রের মধ্যে বিন্দুর মতো টিপ। দ্বীপবাসীর বিচিত্রযাত্রা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনও যোগ নেই। অবশ্য এখন অনেক দ্বীপের সঙ্গে ছোট বিমান আর জাহাজে যোগাযোগ হয়েছে।

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ঝঞ্ঝায় প্রবালদ্বীপের অধিবাসীরা বিপন্ন হয়, মাঝে মাঝে সমুদ্রের বুকে নিশ্চিহ্নও হয়ে যায় প্রবালদ্বীপ।

———

যে দেশে মানুষের ঘরবাড়ি গাছে



আমরা মাটির উপর ঘরবাড়ি বানিয়ে বাস করি। কিন্তু আজব ছুনিয়ায় এমন দেশ আছে যেখানে মানুষ গাছের উপর ঘরবাড়ি বানিয়ে সেখানে বাস করে।

অস্ট্রেলিয়ার মাথার উপরে উত্তরে পাপুয়া নিউ গিনি দ্বীপ। তার পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ভারত মহাসাগর। চারদিকে সমুদ্র, মাঝখানে দ্বীপ।

নিউ গিনির নানা অঞ্চলে নানা আদিম অধিবাসী উপজাতিদের বাস। এখানকার একটি অঞ্চলে উপজাতি মানুষেরা গাছের উপর কাঠের ঘরবাড়ি তৈরি করে। এক সময় অঞ্চলটি ছিল ঘন বনজঙ্গলে ভরা। বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে বড় বড় গাছের উপর কয়েকটি ডালের মধ্যে ছোট ছোট ঘর তৈরি করে বাস করে এই অঞ্চলের উপজাতি অধিবাসীরা। খোপের মত বাসা। মানুষের বসবাসের ঘর। গাছের উপর অনেক উঁচুতে ঘর। কী করে তারা এই ঘরে ঢোকে?

প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে নিচে পর্যন্ত আছে দড়ির মই। তারা এই মই বেয়েই ঘরে ঢোকে।

এখনও এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘন বনে ঢাকা। বনের মধ্যে মাঝে মাঝে আদিবাসী-উপজাতিদের বসতি। গাছের উপর ঘরবাড়ি।

এখানকার উপজাতিরা এখনও জংলি। তাদের পুরুষদের কোমরে জড়ানো ছোট ধুতি, নেংটির মতো। তারা খালি গায়ে থাকে, কোনও পোশাক পরে না। সারা গায়ে উলকি আঁকা। গায়ে স্চ বিঁধিয়ে বা গরম স্চের সেঁকা দিয়ে রঙীন নানা ছবি আঁকাকে বলে উলকি। হাতে তাদের তীক্ষ্ণ বর্শা আর তীরধনুক। তীরের ফলার মুখে লাগানো থাকে বিষ। মেয়েরা ঘাঘরার মাতা পোশাক পরে। কানে শাঁখের মাকড়ি। নাকে কাটের নাকছাবি। অন্যান্য আদিবাসী-উপজাতিদের মতো তাদের মধ্যেও আছে এক একটি দলে একজন করে সর্দার। তার কথা সবাইকে মানতে হয়, তার কথা মতো চলতে হয়। সর্দারের বুকে বেতের ঢাকনি আঁটা, সারা গায়ে চুনখড়ির ডোরাকাটা আঁকা আর বিচিত্র উলকি। সর্দারের সাজ যোদ্ধার সাজ। বুকের ঢাকনি যেন বর্ম।

এখানে আছে প্রচুর নারিকেল গাছ। এছাড়া, আছে নানা ফলমূল।

মজার ব্যাপার হল—তারা পরস্পর নাক ঘসে আদর করে—সম্ভাষণ জানায়। আমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, হাতজোড় করে নমস্কার করি বা হাতে হাত মিলাই। তারা কিন্তু এসব করে না। তার বদলে তারা একজন অপরের থুতনিতে থুতনি ঠেকিয়ে পরস্পর নাক ঘসে আদর করে, শুভকামনা জানায়, সাদর সম্ভাষণ জানায়।

তাদের খাবার-দাবারও বিচিত্র। সাগুর পাতলা পায়েস, রাঙ্গা আলু (বা মিষ্টি আলু) আর কচু সিদ্ধ, ভাজা মাছ, পাকা কলা, আরও সব নানা ফল। মজার কথা হল যে মিষ্টি আলুকে তারা বলে আম আর কচুকে বলে তারো। ছুঁচলো লম্বা কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তারা মাটি খুঁড়ে মিষ্টি আলু ও কচুর চাষ করে। তারা দলবেঁধে সমুদ্রে মাছ ধরে বা মাছ শিকার করে। তাদের আছে নানা ধরণের নৌকা, এছাড়া ডিঙি নৌকা।

তারা নাচগানও করে দলবেঁধে। বাঁশ-কাঠের সঙ্গে সরু তার জুড়ে তারা তৈরি করে এক ধরণের তারের বাদ্যযন্ত্র। তাদের নাচগান দেখবার মতো—বাজনার সঙ্গে তালে তালে ছন্দোবদ্ধ তাদের নাচগান।

———

যে দেশে গাড়ি চালায় কুকুর আর হরিণ



গরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি আমরা দেখে থাকি। কলকাতায় একসময় ট্রামগাড়ি টেনে নিয়ে যেত ঘোড়া। কিন্তু আজব দুনিয়ায় এমন দেশ আছে যে দেশে গাড়ি চালায় কুকুর আর হরিণ।

দেশটা সাদা বরফে ঢাকা। বরফের দেশ-দেশটাকে বলে ল্যাপ দেশ। এখানকার অধিবাসীদের বলে ল্যাপ। বছরের সব সময়ই বরফে ঢাকা থাকে সারা অঞ্চল। আর শীতকালে তো কথাই নেই— বরফ বেশি জমে। এদেশে গরম নেই, নেই গরমের কষ্ট। তার বদলে আছে শীত, খুব শীত আর শীতের কষ্ট। পোশাকেও জমে থাকে সাদা সাদা বরফ—পেঁজা সাদা তুলোর মতো। এখানকার বরফে ঢাকা মাঠ —সাদা ধপ ধপ করে। ঘাস নেই, কোথাও সবুজ মাঠ দেখা যায় না।

এখানকার গাড়ির নাম শ্লেজ। চাকা নেই। হরিণের হাড় আর চামড়ায় তৈরি গাড়ি, বেশ মজবুত। বরফের উপর বরফ কেটে চলে এই গাড়ি। এই গাড়ি চালায় হরিণ। তার নাম বল্‌গা হরিণ। এই হরিণের মাথায় দুটো শিং হলেও তাতে অনেক শাখা-প্রশাখা। বল্‌গা হরিণেরা বরফে-ঢাকা মাঠে শিং দিয়ে বরফ খুঁড়ে নিচের শেওলা খায়।

শেওলা জলজ উদ্ভিদ। বরফ গলে হয় জল। তাই এখানে শেওলা বেশি জন্মায়। এছাড়া, হরিণেরা খায় ব্যাঙের ছাতার মতো এক ধরণের ছত্রাক। এখানে এই ছত্রাকও খুব জন্মায়। হরিণেরা বরফও খায়।

আবার এখানকার কুকুরেরাও এই গাড়ি টানে। অনেকগুলি কুকুর একসঙ্গে টানে গাড়ি। তীরবেগে ছোটে। বেশ মজার। তবে এদেশের কুকুর আমাদের দেশের মতো কুকুর নয়। সারা গায়ে লোমে ঢাকা। পশমের মতো লোম।

এদেশের ঘরবাড়িও আমাদের মতো নয়। গোল ঢিপির মতো এদেশের বাসস্থান। পরপর পাথর সাজিয়ে তৈরি। এছাড়া, তারা তাঁবুর মতো দেখতে ঘরেও বাস করে। বল্‌গা হরিণের চামড়া দিয়ে মোড়া তাঁবুর মতো এই ঘরের খুঁটি হল বল্‌গা হরিণের হাড়।

এই শীতের দেশের মানুষদের পোশাকও মজার। পোশাকেই তাদের দেহের প্রায় সব অংশ ঢাকা থাকে। গরম মোটা পোশাক। পুরুষদের লম্বা ফুলকোট, পায়জামা। মেয়েদের হাত অবধি জামা আর ঘাগরা। তাদের পোশাকও বল্‌গা হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি। মাথায় টুপি। হাতে দস্তানা। পায়ে ঢাকা জুতো। এদেশের মানুষ রঙীন পোশাক ভালবাসে। নীল-লাল-সবুজ-হলুদ-কালো রঙের পোশাক পরে। অনেকের পোশাকে থাকে ডোরাকাটা দাগ। দেখতে খুব সুন্দর। চামড়ার মোটা পোশাক, তাই বেশ ভারিও। শীতের দেশে এমন পোশাক না হলে চলে না। লাল রং তাদের খুব প্রিয়।

কীভাবে এই পোশাক তৈরি হয়? তাও বেশ মজার। বল্‌গা হরিণের শিরা হল সূতো আর হাড় হল সূচ। বল্‌গা হরিণের চামড়া

এই সূতোয় সেলাই করে পোশাক তৈরি করা হয়। এখানকার ঘরে ঘরে তৈরি হয় এই পোশাক। বাইরে থেকে কিনতে হয় না। নিজেদের পোশাক নিজেরাই তৈরি করে পরে। বল্‌গা হরিণের চামড়ায় শেওলা পুরে তৈরি হয় বালিশ, তোষক, বসার গদি। এছাড়া বল্‌গা হরিণের লোমে তৈরি হয় কম্বল। বেশ মোটা পুরু কম্বল।

এদেশের খাদ্য হল বল্‌গা হরিণের দুধ আর মাংস। বল্‌গা হরিণের মাংস উপাদেয় খাদ্য।

শীতকালে সূর্যের মুখ দেখা যায় না। আবার, যখন এদেশে সূর্য দেখা যায়, তখন সব সময়েই যেন দিন। সূর্যের রোদে বরফ গলে জল হয়। তখন এখানে গাছপালা দেখা যায়। এখানে তখন নানা ফুলের মেলা—রঙবেরঙের রকমারী ফুল। কি বিচিত্র শোভাময় চারদিক! চারদিকে শুধু ফুল আর ফুল।

সিনেমায় বরফের উপর স্কি খেলা অনেকেরই দেখা আছে। এখানে সকলেই স্কি ব্যবহার করে। স্কি হল এক জোড়া সরু লম্বা কাঠ। জুতোর নিচে বেঁধে বরফের উপর খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। হাতে থাকে লাঠি। উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় লাফিয়ে নামাও যায়। নিমেষের মধ্যে অনেক দূর যাওয়া যায়। বরফ ছাড়া স্কি চলে না। বরফের উপর স্কি চালিয়ে ছুটে ছুটে খেলাধূলাও করে এখানকার মানুষ। ছোট বড় সব বয়সের মানুষ স্কি চালাতে পারে। বরফের উপর পড়ে গেলে কোন ক্ষতি হয় না—হাড়গোড় ভাঙ্গে না।

বল্‌গা হরিণ না থাকলে এদেশ হত অচল। এদেশের অধিবাসীরা বল্‌গা হরিণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

———



মানুষ শিয়াল-কুকুরের মাংস খায়! ভাবতে অবাক্ লাগে। আজব তুনিয়ায় এমন দেশও আছে যেখানকার মানুষ শিয়াল-কুকুরের মাংস খায়। আর কী খায়? শিয়াল-কুকুর ছাড়াও তারা খায় ভালুক, শুয়োর আর হরিণের মাংস। এছাড়া, বুনো নানা পাখির ডিম, টাটকা মাছ, শুকনো মাছ, সীল মাছের চর্বি আর বনের নানা ফলমূল। এখানকার বনে আছে বুনো জামগাছ। এই বুনো জাম খেতে তারা খুব ভালবাসে। এখানে গম-ভুট্টার চাষ হয়, তা থেকে ময়দা হয়। ময়দায় তারা মোটা ও বড় আকারের রুটি তৈরি করে খায়। এখানে বাদামও হয়. তারা বাদাম খায়।

দেশটি সোভিয়েত রাশিয়ায় সাইবেরিয়ার দক্ষিণে বিরাট বনাঞ্চল। এত বড় লম্বা বন পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এই বনের উত্তর-দক্ষিণ দিকে চওড়া আর পূর্ব-পশ্চিম দিকে লম্বা। বনাঞ্চলের নাম টাইগা। বনের পূর্বদিক আমুর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।

আমরা সকলেই ভালুক দেখেছি। ভালুক দেখতে কেমন— আমাদের জানা। ভালুকের গায়ের রঙ আমরা কালো বলেই আমরা

জানি। কিন্তু এখানকার ভালুকের গায়ের রঙ মেটে। গভীর বনের ভিতর মেটে রঙের ভালুকেরা থাকে। পাহাড়ের গুহায়-ফোকরে আর বড় মোটা গাছের কোটরে ভালুকেরা বাস করে। ভালুকের প্রিয় খাদ্য ইঁদুর। এই বনে ভালুকের সামনে গর্ত থেকে ধেড়ে ইঁদুর বের হলেই ভালুক থাবায় ধরে মুখে পুরে খেয়ে ফেলে। এই ভালুকের সঙ্গে বনের মধ্যে একা একজন মানুষের দেখা হলে ভালুক কিন্তু তাকে ছেড়ে দেবে না, তাকেও আক্রমণ করবে। মজার ব্যাপার হল যে এই বনের অধিবাসীদের প্রিয়খাদ্য হল ভালুকের মাংস। তাই তারা জীবিত ভালুক শিকার করে, শিকারের সময় ভালুককে মারে না। জীবিত ভালুক ধরে নিয়ে গিয়ে তারা বাড়িতে ছোট খাঁচাঘরে আটকে রাখে। মাংস আর মধু খাইয়ে ভালুককে মাংসল মোটাসোটা গোলগাল নাদুস-নুদুস করে তোলে। তারপর একদিন সেই ভালুককে কেটে তার মাংসে হয় তাদের বিরাট ভোজ আর আনন্দ অনুষ্ঠান।

বনাঞ্চলের অধিবাসীদের বলা হয় গিলিয়াক। তাদের গায়ের রঙ হলদে।

তারা পরে সূতোয় বোনা কাপড়ের পায়জামা, গায়ে বড় কোট, মাথায় রোদ-টুপির মতো টুপি আর পায়ে বুট জুতো। তাদের কোমরে থাকে ধারালো ছুরি আর হাতে থাকে লম্বা ছুঁচালো বর্শা।

তারা তামাক খেতে ভালবাসে। তারা নলে তামাক খায়। তাই তাদের কোমরে ঝোলে তামাক খাবার নল। তামাক খাবার পাইপ আমরা সকলেই দেখেছি। তাদের নল হল পাইপ।

বনের মধ্যেই গিলিয়াকেরা বাস করে। বন কেটে জায়গা ফাঁকা করে সেখানে উঁচু কাঠের মাচা তৈরি করে। এই মাচার উপর তাদের

বসবাসের কাঠের ঘরবাড়ি। বেশ মজবুত। মাচা পর্যন্ত কাঠের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে মাচার উপরে ঘরে যাওয়া যায়। তাদের ঘরের চাল গাছের বাকলে ঢাকা।

এখানে খুব শীত। শীতকালে এখানে বরফ পড়ে আর জমে। তারা ব্যবহার করে ছোট স্লেজ গাড়ি। এই গাড়ি টানে কুকুর। তারা বাড়িতে কুকুর পোষে। তাদের প্রত্যেক পরিবারে আছে অনেকগুলি করে কুকুর। কুকুর তাদের অনেক কাজে লাগে। তাদের শিকারের সময় কুকুরের দলকে তারা বনের মধ্যে নিয়ে যায়। শিকারে কুকুর সাহায্য করে। শীতে বরফ পড়লে কুকুরেরা স্লেজ গাড়ি চালায়। আর তাদের খাবারের অভাব হলে তারা কুকুরের মাংসও খায়। পৃথিবীতে গিলিয়াকেরা ছাড়া আর কেউ কুকুরের মাংস খায় না।

বনের মধ্যে ছোট ছোট হ্রদ আর জলা আছে। সেখানে তারা জাল দিয়ে মাছ ধরে। এছাড়া, আমুর নদীতেও তারা মাছ ধরে। তাদের নৌকা হল ডিঙির মতো ছোট নৌকা। এই নৌকায় চড়ে তারা মাছ ধরে। টাটকা মাছ তারা রান্না করে খায়। আবার মাছ রোদে শুকিয়ে রাখে। পরে সেই শুঁটকী মাছ তারা রান্না করে খায়। কী দুর্গন্ধ! অথচ, তাদের কাছে শুঁটকী মাছ খুব প্রিয় খাবার।

তাদের জীবন হল গাছ নির্ভর। বনে অনেক রকমের গাছ। এই সব গাছের কাঠে তারা নৌকা তৈরি করে। তাদের ব্যবহারের বাসন-কোসন সবই কাঠের তৈরি। গামলা, হাতা, থালা, বাটি সব কাঠেই তৈরি।

শীতকালে তারা পশমের গরম পোশাক পরে আর পায়ে দেয় বুট জুতো। তারা কিন্তু এসব পোশাক নিজেরা তৈরি করতে পারে না।

তারা বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসে। তবে পোশাক ছিঁড়ে গেলে তাদের পরিবারের মেয়েরা সেলাই করে দেয়। তাদের সূচও আমাদের মতো লোহার সূচ নয়। তাদের সূচ হল কাঠের, মোটা লোহার সূচের মতো সরু কাট। মেয়েরাই এখানে এই কাঠের সূচ দিয়ে মাছ ধরবার জালও বোনে।

গিলিয়াক মেয়েরা খুব কাজের। সংসারের যাবতীয় কাজ করে। রোজ তারা নানা রকম রান্না করে। সীল মাছের ছর্বি, বুনো জাম, বাদাম আর ময়দা নিয়ে তারা মাংস রান্না করে। মাংসের ঝোলের কি বিচিত্র স্বাদ ! আমরা কেউই এই ঝোল খেতে পারব না। আর খেলেও হজম করতে পারব না। তারা হরিণের দুধ খায়।

গিলিয়াকেরা রোজ রাতে নিজেরা নাচগান বাজনা করে। জমজমাট আসর। দল বেঁধে তারা গান করে, নাচে, তালে তালে, বাজনা বাজায়। মস্ত বড় কাঠের জয়ঢাক, মেটে ভালুকের চামড়া দিয়ে মোড়া। গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে বাজায়। কী ভয়ানক তার আওয়াজ। আর আছে তাদের নানা বাদ্যযন্ত্র। কাঠের কাঠামোয় তার লাগানো থাকে। এছাড়া, সারিদার মতো তাদের বাদ্যযন্ত্র আর কাঠের সঙ্গে চাকতি লাগানো ঝুমঝুমি।

যে দেশে আছে বনমানুষ



বোর্ণিও।

একটি দ্বীপের নাম। ভারত মহাসাগরে এই দ্বীপ অবস্থিত। বোর্ণিও-র আধুনিক নাম কালিমান্তান।

এখানকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গভীর বনে আছে বনমানুষ। বড় বড় উঁচু গাছ-গাছালি আর লতাপাতার ঘন বন। এত ঘন যে দিনের বেলাও সেখানে সূর্যের আলো ঠিকমতো পেঁছায় না। সেখানে দিনেও যেন রাতের মতো অন্ধকার। রোজ দিনরাত সেখানে বৃষ্টি হয়। ফলে সেখানকার মাটি ভিজা স্যাঁতসেঁতে। এই বনেই আছে বনমানুষ।

বনমানুষের সঙ্গে মানুষের অনেক মিল আছে। বনমানুষেরা স্তন্যপায়ী প্রাণী। আমরা যেমন জন্মাবার পর শিশুকাল পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়ে বড় হই, তেমনি বনমানুষেরাও ছোটবেলায় তাদের মায়ের দুধ খায়। ইংরেজিতে বনমানুষদের বলে এপ (APE)। টারজনের কথা আমরা বইতে পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি। মানুষ-শিশু টারজন বনমানুষ-মা-র কাছে বড় হয়েছিল, তাই তাকে টারজন এপম্যান বলা হয়।

নানা রকমের বনমানুষ আছে। গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং ও

উল্লুক হল বনমানুষ। তাদের দেহ সুগঠিত ও বলশালী। তাদের লেজ নাই। তাদের দুই হাত দুই পায়ের চেয়ে লম্বায় অনেক বড়। মানুষের মতো দুই পায়ে হাঁটতে পারলেও দেহের ভার দুই পায়ে রাখতে পারে না। গাছের ডালপালা ধরে ঝুলে লাফিয়ে চলতেও পারে। বনমানুষের হাত বিশেষ করে হাতের বুড়ো আঙ্গুল মানুষের হাতের মতো। বনমানুষ বনের ফলমূল, লতাপাতাশাক খায়। কীটপতঙ্গও তারা খায়।

বনমানুষদের বুদ্ধি আছে, তারা মানুষের মতো অনুকরণ করতেও পারে।

বড় উঁচু গাছের উপরে ডালপালার মধ্যে শুকনো ডালপালা-লতাপাতা দিয়ে মজবুত মাচার মতো তৈরি করে সেখানে বাস করে বনমানুষেরা। আবার গাছের নিচেও ঐভাবে মাচার বাসা বানিয়ে বাস করে। মানুষের মতো বিছানায় শুয়ে ঘুমাতে তারা ভালবাসে। অবশ্য তাদের বিছানা মানুষের মতো নয়। শুকনো পাতার বিছানা। এক একজন বনমানুষ এক একটি বিছানায় শুয়ে ঘুমায়। শিশুরা অবশ্য মায়ের সঙ্গে থাকে এক বিছানায়। রোদকে আড়াল করার ও বৃষ্টি যাতে না পড়তে পারে তারজন্য তারা তাদের বিছানার উপর লতাপাতার ছাউনিও তৈরি করে। বনমানুষদের কাছে নদী-পুকুর-সমুদ্র হল বিপদের। কারণ তারা সাঁতার কাটতে পারে না। জলে পড়ে গেলে সাঁতার কাটতে না পারায় তারা ডুবে মারা যায়। তাই বনমানুষেরা জলকে এড়িয়ে চলে।

বনমানুষদের মধ্যে গরিলারা হল সবচেয়ে বড় আকারের। গরিলারা পরিবার নিয়ে বাস করে। তাদের পরিবার ছোট। এক বা দুই স্ত্রী গরিলা আর কয়েকটি শিশু গরিলাসহ পুরুষ কর্তা গরিলা নিয়ে

এক একটি পরিবার। দিনের বেলায় খাবার-দাবার সংগ্রহ করে। রাতে স্ত্রী-গরিলা শিশুদের নিয়ে গাছের উপরে বাসায় বিছানায় ঘুমায়। পুরুষ কর্তা-গরিলা গাছের নিচে বিছানায় ঘুমায়। বিপদের সময় গরিলারা দুই হাতে নিজেদের বুক চাপড়িয়ে শব্দ করে। বনের অন্যান্য জন্তুজানোয়াররা গরিলাদের কোন ক্ষতি করে না। পাহাড়ী এলাকার গরিলাদের লোম কালো রঙের। আফ্রিকার কিভু হ্রদ-এলাকায় পাহাড়ে ও কঙ্গোর পূর্বে উগাণ্ডা পর্যন্ত পাহাড়ী এলাকায় এই গরিলারা বাস করে। সমতলভূমির গরিলাদের গায়ের লোম ছাই রঙের এবং মধ্য আফ্রিকার পশ্চিমে বনে এই গরিলারা বাস করে।

শিম্পাঞ্জী বনমানুষেরা খুব বুদ্ধিমান, তারা পোষও মানে। আফ্রিকার নিরক্ষরেখা অঞ্চলে তারা বাস করে। তারা মানুষের মতো অঙ্গভঙ্গী করতে পারে। দুপায়ে ভর দিয়ে তারা হাঁটতেও পারে। তবে তারা বেশি দিন বাঁচে না। তাদের গড় আয়ু পঁচিশ বছর।

বোর্ণিও ও সুমাত্রা দ্বীপের বনাঞ্চলে যে বনমানুষেরা বাস করে তারা হল ওরাং-ওটাং। তারা আকারে বেশ বড় হয়। তাদের লোম লাল বা মেটে রঙের হয়। তারা লাফ দিতে পারে না। এক গাছ থেকে অন্য গাছে ঝুলে যায়। তারা দল বেঁধে বাস করে না। কাঁচা টক ফল খেতে ভালবাসে।

উল্লুক ও বনমানুষ। তবে আকারে ছোট। তাদের বুদ্ধিও নেই। তাই বুঝি মানুষের মধ্যে উল্লুক বলে গালি দেওয়ার রীতির প্রচলন হয়েছে। উল্লুকদের হাত দুটি বেশ লম্বা। হাঁটতে পারে না। গাছ থেকে গাছে দ্রুত ঝুলে চলাফেরা করে। তারা ফলমূল, কচিপাতা, কীটপতঙ্গ ছাড়া নানা পাখির ডিম ও ছানা তারা খায়। মাকড়সা

খেতে ভালবাসে। তারা সপরিবারে বাস করে। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, ভূটান, তিব্বত ও ভারতের আসামে ছোট আকারের উল্লুক আছে। মালয়েশিয়া ও সুমাত্রায় বড় আকারে কালো রঙের উল্লুক আছে।

বোর্ণিও দ্বীপে আর এক ধরণের বনমানুষ আছে, তাদের বলে গিবন। বোর্ণিও-তে ওরাং-ওটাং বনমানুষেরাই বেশি। এখানে খুব কলা হয়। কলা তাদের প্রিয় খাবার।

এই দ্বীপের বনাঞ্চলে যেখানে বনমানুষেরা বাস করে, সেখানে জংলী আদিবাসী মানুষেরাও বাস করে। তারা বনের মধ্যে কাঠের তৈরি মাচার উপর বাস করে। মাথায় তালপাতার চাল। দেওয়াল নেই, তিন দিক ফাঁকা। চাল পিছনে মাচার সঙ্গে মিশেছে, সামনে ফাঁকা। তাদের এই মাচার ঘর হল তিনকোণা। এই ঘরে তারা বাস করে। তবে খাবার ফুরিয়ে গেলে আবার তারা দলবেঁধে বনের অন্য এলাকায় চলে গিয়ে সেখানে মাচার ঘর বানিয়ে বাস করে। তারা শিকার করতে পারে। বনের পাখি, হরিণ শিকার করে তারা তার মাংস খায়। তারা পোশাক পরে না। কোমরে নেংটি কপনি পরে। তাদের অস্ত্র হল লোহার ছুরি,দা, কুড়াল আর তীরের ফলা। তাদের কোমরে থাকে মোটা চোঙ, তার মধ্যে থাকে তীরের ফলা। এই তীর তারা ধনুকে ছোঁড়ে না। খুব লম্বা লোহার নলের মধ্যে দিয়ে তীরের ফলা ছোঁড়ে। ফলে ঠিক নিশানায় তীর গিয়ে বেঁধে। নলের পিছনে যেখানে হাত দিয়ে তারা ধরে থাকে, সেখানে মোটা লোহার তার কাঠে এমনভাবে আটকানো থাকে যে কাঠটি নড়ালেই নলের মধ্যে দিয়ে তীরের ফলাটি বের হয়ে দূরে যায়। আবার কাঠের কাঠি নলের পিছনে ঠেলে দিয়েও

তারা তীরের ফলা ছোঁড়ে। উঁচু গাছে বসে থাকা পাখিকে তারা এই তীরের ফলা ছুঁড়ে অনায়াসে শিকার করতে পারে। তাই, তাদের শিকার বিফল হয় না। শিকারে তারা ছোটবেলা থেকেই হয়ে ওঠে পটু। তবে এসব অস্ত্রশস্ত্র তারা নিজেরা তৈরি করতে পারে না। দূরে গাঁয়ের বসতিতে কামারশালায় গিয়ে তারা তৈরি করে নিয়ে আসে।

শিকারের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে যাওয়া ছাড়া তারা সাধারণত লোকালয়ে যায় না।

তারা দ্বীপের আদিবাসী ও উপজাতি। ভূত-প্রেত মানে। তাদের নানা কুসংস্কারও আছে। রোগ-ভোগ হলে নিজেরাই টোটকা ওষুধে চিকিৎসা করে।

সমুদ্রেঘেরা দ্বীপ বোর্ণিও-এর এই বনাঞ্চলে বনমানুষ আর জংলী মানুষ বাস করে, তারা কেউ কারও ক্ষতি করে না, পরস্পরকে ভয়ও পায় না।



অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ। অস্ট্রেলিয়া একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ বিশেষ। পূর্বে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে নানা সাগর আর দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর। অস্ট্রেলিয়ার চারদিকেই নীলাভরণ তুরন্ত সফেন জলরাশি।

এই বিশাল দ্বীপের মধ্যস্থলের একটি অঞ্চল। বৃষ্টি একেবারে হয় না। শুকনো মাটি। মরুভূমির মতো রুক্ষ। দিনে দারুণ রোদ। বেশ গরমের দেশ।

এখানকার বনাঞ্চলে আছে ক্যাঙারু। সামনের তুই পা ছোট, পিছনের তুইপা বেশ লম্বা। খাড়া লম্বা কান। মাথায় শিং নেই। দেহের পিছনের দিকটা বেশ চওড়া। পেটের ভিতর থলি, সেখানে বাচ্চা ক্যাঙারু থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। তারা দল বেঁধে চলে।

এখানে বাস করে জংলী আদিম অধিবাসীরা। তারা এখনও আদিম যুগেই আছে। আধুনিক সভ্য মানুষের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। তারা নির্দিষ্ট এক জায়গায় থাকে না, ঘুরে বেড়ায় নানা জায়গায়—

যাযাবরের মতো। ঘরবাড়ি বানিয়ে বাস করে না। গাছের পুরু বাকলের নৌকার ছই-এর মতো চালায় তারা মাঝে মাঝে বাস করে।

তাদের খাবার দাবার খুব বিচিত্র। তারা মাটি খুঁড়ে সাপ ধরে খায়। ব্যাঙ, ইঁদুর, গিরগিটি ও পিঁপড়ে খায়। এছাড়া, তারা খায় ক্যাঙারুর মাংস। বনের নানা পাকা ফল তাদের প্রিয় খাবার। বাইরে থেকে গম-যব এনে ছাতু বানিয়ে বা রুটি সেঁকেও তারা খায়। এখানে মাটির নিচে হয় অনেকটা আমাদের শাঁকালু (শাঁক আলু)-এর মতো মূল, মাটি খুঁড়ে বের করে এই মূলও তারা খায়। এই মূল হল জলভরা। তাই এই মূল খেয়ে তারা জল তৃষ্ণা মেটায়। অবশ্য, বনের মধ্যে ছোট ছোট জলাশয়ের জলও তারা খায়।

তারা আমাদের মতো রান্না করে কোন খাবার খায় না? এমন কি মাংসও। আগুনে ঝলসিয়ে বা সেঁকে তারা খায়। তাদের কোনও উনুন নেই। শুকনো ঘাসে আগুন ধরিয়ে তাতেই ঝলসায় সেঁকে। আর আগুনও জ্বালে তারা চকমকি পাথর পরস্পর ঘসে। মাটিতে গর্ত করে শুকনো কাঠ-খড়কুটো ঘাস জ্বালিয়ে তারা মাংস ঝলসায়, সেঁকে।

তারা পোশাক পরে না। গাছের ছাল ও বাকলের নেংটি পরে। তাদের সারা দেহে খড়িমাটির নানা দাগ ও উলকি আঁকা থাকে। গায়ের রঙ কালো। তাই সাদা খড়িমাটির দাগ গায়ে থাকায় তাদের দেখতেও লাগে বিচিত্র।

এই জংলী মানুষেরা শিকারে খুব পটু। রোজ তারা শিকার করে। দলবেঁধে কৌশলে ক্যাঙারু ধরে। সেদিন রাতে হয় তাদের ক্যাঙারুর ঝলসানো মাংসের ভোজ।

বুমেরাং। শব্দটি আমাদের অজানা নয়। বাংলা শব্দ নয়। কিন্তু বাংলা খবরের কাগজে প্রায়ই ব্যবহার হয়। শব্দটির ইংরেজী বানান —Boomerang। অভিধানে লেখা আছে যে বুমেরাং হল অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের অস্ত্র। শক্ত কাঠের তৈরি প্রায় অর্ধ-বৃত্তাকার বাঁকানো ক্ষেপনাস্ত্র। এই অস্ত্র নিক্ষেপ করার পর যে নিক্ষেপ করে আবার তার কাছেই ঘুরে ফিরে আছে। তিনকোণা অর্ধ-বৃত্তাকার। যেখান থেকেই নিক্ষেপ করা যাক না কেন-আবার সেখানে ফিরে আসবেই। অস্ট্রেলিয়ার বনাঞ্চলের জংলী আদিবাসীরা এই কাঠের তৈরি বুমেরাং অস্ত্র দিয়েই ক্যাঙারু শিকার করে। অন্য কোনও দেশের মানুষ এই অস্ত্র ব্যবহার করে না। এছাড়া, তারা বর্শা ও কাঠের কাটারিও শিকারে ব্যবহার করে।

———

যে দেশ নামে সবুজ, রঙে সাদা



গ্রীণল্যাণ্ড। সবুজদেশ—সবুজ দ্বীপ, নামে সবুজ। কিন্তু এই নামে সবুজ দেশ আসলে রঙে সাদা, এই দেশ হল সাদা বরফের দেশ। তাছাড়া, এখানকার জীবজন্তুর রঙ সাদা।

উত্তরে ও পূর্বে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ। এই দ্বীপ সুমেরু অঞ্চলে অবস্থিত। সুমেরু বৃত্তের হিম মণ্ডলে এই দ্বীপের অবস্থান। আর্কটিক সমুদ্রকে ঘিরে রয়েছে সুমেরু মহাদেশ। গ্রীণল্যাণ্ড সুমেরু মহাদেশের একটি দ্বীপ।

গ্রীণল্যাণ্ড নামে সবুজদ্বীপ হলেও বরফের রাজ্য। সাদা ধবধবে জমা বরফ। হিমবাহ আর হিমশৈলের দেশ গ্রীণল্যাণ্ড। শীতকালে এখানে বরফ জমে। চারদিকে বরফ ছাড়া তখন আর কিছুই নেই। কিন্তু গরমকালে এখানকার দৃশ্য যায় পালটিয়ে। গরমকালে বরফ গলে যায়, বরফ থাকে না। এদেশে তখন চারিদিকে সবুজের সমারোহ। রঙবেরঙের ফুল ফোটে আর ওড়ে রঙবেরঙের প্রজাপতি। আর

চারদিকে সবুজ গাছপালা, সবুজে ভরে যায় এই দেশ। গরমকালে এদেশের নাম গ্রীণল্যাণ্ড বা সবুজদেশ-সবুজদ্বীপ-সবুজভূমি সার্থক হয়।

মজার ব্যাপার হল যে এখানে আছে সাদা ভালুক। সাদা ভালুক এই অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও নেই। সাদা ভালুক বরফ ছাড়া থাকতে পারে না। সাদা ভালুক জলের মধ্যে ডুব দিয়ে সাঁতার দিতেও পারে। এখানে আছে সামুদ্রিক জীব সীল মাছ। তার গায়ের রঙও সাদা। বরফের সাগরে সীলমাছেরা নিজের খেয়াল খুশী মতো চলাফেরা করে।

এদেশের শিয়াল-কুকুরও সাদা রঙের। খরগোশ আছে প্রচুর, তার রঙ তো সাদাই। তাই, বলা যেতে পারে যে এই নামে সবুজ-ভূমির সব জীবজন্তুর গায়ের রঙ সাদা। এছাড়া, এখানে আছে বল্‌গা হরিণ, ক্যারিবু আর অনেক রকম পোকামাকড়।

এখানে যারা বাস করে তারা হল এসকিমো। অবশ্য, কানাডার উত্তরে অবস্থিত আলাস্কাতেও এসকিমোরা আছে। তাদের বাসগৃহের নাম ইগলু। ইগলু দেখতে ঠিক উল্টানো গামলাব মতো, অর্ধেক গোলাকার। ভিতরে ঢোকবার জন্য একদিকে ছোট ফাঁক বা ফোকর থাকে। তারা হামাগুড়ি দিয়ে এই ঘরে ঢোকে। পাথর আর মাটির চাপড়া দিয়ে এই ঘর তৈরি করে। বাইরের পাথর থরে থরে সাজানো। আবার ঘরের মেঝেতে বিছানো। দেওয়ালের বাইরের দিকে পাথর থাকলেও ভিতরের দিক সীল মাছের চামড়ায় মোড়া। এমন বিচিত্র বাসগৃহই হল ইগলু। ইগলু দেখতে বেশ। পৃথিবীর আর কোথাও এমন ঘর নেই। অবস্য, তারা আজকাল কাঠ দিয়ে ঘরও তৈরি করে বাস করে।

এসকিমোরা তাদের পোশাক তৈরি করে সীল মাছের চামড়া দিয়ে। পুরু মোটা পোশাক। খুব শীতের দেশে তারা বাস করে। তাই এমন পোশাক না হলে তাদের চলবে কেন? তারা সীল মাছ শিকার করে লম্বা বর্শা দিয়ে। এছাড়া, তারা নানা ধরণের তীর, ধনুক, বল্লম, সড়কি জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে।

এসকিমোরা আমাদের মত তেল ব্যবহার করে না। তারা সীল মাছের চর্বি ব্যবহার করে। এই চর্বিতেই তারা ঘরে প্রদীপ জ্বালায়। তাদের প্রদীপ পাথরে তৈরি। পলতে হল শুকনো শেওলা। তারা ইগলুর মধ্যে পাথরের উঁচু বেদীতে বিছানা পেতে ঘুমায়।

এসকিমোদের খাবার-দাবারও বিচিত্র। সীল মাছ তাদের প্রিয় খাবার। সীল মাছের রক্ত তারা খায়। সীল মাছ আর তার চর্বি তারা খেতে ভালবাসে। এখানে নানা রকমের সীল মাছ খুব পাওয়া যায়। তারা সীল মাছ শিকার করে। সীল মাছ ছাড়া তাদের জীবন চলে না। তাদের জীবন সীলমাছ-নির্ভর। সীল মাছের চামড়া দিয়ে তারা তাদের সমুদ্রে সীল মাছ শিকারের নৌকা তৈরি করে। সীল মাছের চামড়ায় তারা তাঁবু জাতীয় আচ্ছাদন বানিয়েও বাস করে। এছাড়া, সীলমাছের চামড়ায় তারা চাবুক বানায়। তাই, সীলমাছ ছাড়া তাদের জীবনযাত্রা অচল।

এখানে সমুদ্রে আছে নানা প্রজাপতির তিমি আর সিন্ধুঘোটক। তারা এই দুই সামুদ্রিক জীবকে শিকার করে তার মাংস খায়। গরমকালে খায় এখানকার টেপারি বুনো ফল। গ্রীণল্যাণ্ড সহ সুমেরু মহাদেশের নানা জায়গায় এসকিমো ছাড়াও অন্যান্য আদিবাসী-উপজাতিরা বাস করে।

সুমেরুবৃত্তে অবস্থান হেতু এখানে শুধু শীতই প্রবল নয়, বছরে প্রায় ছমাস সূর্য ওঠে না। এখানে শীত বেশি হবার কারণ হল এখানে সূর্যের কিরণ সোজাভাবে পড়ে না। গ্রীষ্মকালে এখানে ছয় মাস দিনের মতো আলো, শীতকালে ছয় মাস রাতের মতো অন্ধকার। গ্রীষ্মকালে রাতেও এখানে সূর্য দেখা যায়, তাই উত্তর মেরু অঞ্চলকে বলে নিশীথ সূর্যের দেশ।

—— ——

যে দেশে মানুষ নেই



কুমেরু—একটি দেশ নয়, একটি মহাদেশের নাম। এখানে মানুষ নেই। মানুষ এখানে বাস করে না। মানুষহীন এই মহাদেশের রহস্য ভেদে দুঃসাহসী মানুষেরা সেখানে অভিযান করেছে, করছে।

বিচিত্র এই মহাদেশ কুমেরু। কুমেরুর নাম আণ্টার্কটিকা। তুষার ধবল শ্বেতশুভ্র হিমময় দুর্জয় মহাদেশ। এই স্থান হল পৃথিবীর দুর্গমতম, উচ্চতম, শীতলতম ও শুষ্কতম। এই মহাদেশের ৯৮ শতাংশ দু-তিন কিলোমিটার পুরু বরফে ঢাকা থাকে। শেওলা উদ্ভিদ ছাড়া প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। অবশ্য এখানকার সামুদ্রিক প্রাণী পেঙ্গুইন ও স্কুয়া প্রভৃতি নানা প্রজাপতির পাখি, সীলমাছ ও তিমি সমুদ্রের খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। তারা সমুদ্রে ও সমুদ্রের বরফের উপরই চলাফেরা করে, তাই তাদের ডাঙার প্রাণী বলা যায় না।

এখানে আছে শুধু বরফ, পাথর, পাহাড়, হিমবাহ আর হিমশৈল। আমরা জানি বরফ জলের চেয়ে হালকা' তাই বরফ জলে ভাসে। এখানে বিশাল বিশাল বরফখণ্ড সমুদ্রে ভাসছে। রকমারী তাদের

আকার-আকৃতি, দেখতেও বেশ সুন্দর। শীতে এখানে বরফ জমে পাথর। আবার গরমে বরফ গলে। এখানকার চারদিকে বছরের বেশির ভাগ সময়েই দেখা যায় দুধসাদা বরফ। বিরাট বিরাট হিমশৈল সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়।

আণ্টার্কটিকা বা কুমেরু মহাদেশেকে ঘিরে আছে দক্ষিণ সমুদ্র। কুমেরু বৃত্তের ভিতরে কোন তুন্দ্রা অঞ্চল বা গাছপালার অঞ্চল নেই। এখানে উদ্ভিদ্ জন্মায় বটে, কিন্তু এখানকার উদ্ভিদ্ হল শেওলা জাতীয় —জাতীয় মস আর লাইকেন।

এখানকার বিপদ হল ভয়ঙ্কর তুষারঝড়। মাঝে মাঝেই সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে সামুদ্রিক ঘুর্ণিঝড় ঝঞ্ঝায় সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে ও দ্বীপসমূহে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়, ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ডে বহু প্রাণ হানি ঘটে, ঘরবাড়ি ভেঙে যায়, এমন কি দ্বীপ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তেমনি হল কুমেরুর তুষারঝড়। কিন্তু কুমেরুতে জনপ্রাণী নেই, নেই ঘরবাড়িও। এখানে মানুষের বসতি থাকলে আর রক্ষা ছিল না। ভয়াবহ তুষারঝড়ে এলাকার চেহারা পালটিয়ে দেয়।

পেঙ্গুইন হল হিমজগতের অধিবাসী। এখানে দল বেঁধে বাস করে পেঙ্গুইন পাখী। পেঙ্গুইন অন্য কোথাও নেই। ছুঁচালো ঠোঁট। কালো মুখ। ডানার ও দেহের পিছনের রঙ কালো কিন্তু সামনের দিক ধবধবে সাদা। তারা দুইপায়ে চলে। পেঙ্গুইনের গায়ে থাকে খুব শক্ত আঁশের পালক। সমুদ্রের চিংড়িমাছ তাদের খাবার। পেঙ্গুইনেরা সমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে। তাঁরা সাঁতারে পটু। সমুদ্রের জলে ডুব দিতেও পারে। বিজ্ঞানীদের মতে পেঙ্গুইন হল পৃথিবীর আদিম পাখিদের অন্যতম।

আণ্টার্কটিকায় আছে ঈগল জাতীয় স্কুয়া নামে শিকারী পাখি।

এই মহাদেশে মানুষের পদার্পণ ঘটে ১৭৭২ সালে। তার আগে মানুষ এখানে যেতে পায়েনি। ১৭৭২ সালে জেমস কুক কুমেরু বৃত্ত সর্বপ্রথম অতিক্রম করেন। পালতোলা জাহাজে তিনি কুমেরু মহাদেশের বরফজমা সমুদ্রে দুঃসাহসী অভিযান করেছিলেন। হিমময়ী কুমেরু মহাদেশে অজানার সন্ধানে রহস্য উন্মোচনে জীবন তুচ্ছ করে অভিযান করেছেন জেমস কুক, স্কট, আমুণ্ডসেন, শ্যাকল্‌টন, ফুকস, ইভানস প্রমুখ নির্ভীক অভিযাত্রী।

বর্তমানে কুমেরু মহাদেশে পৃথিবীর নানা দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন। আমাদের দেশ ভারতও পিছিয়ে নেই। ১৮৯১ ও১৯৮২ সালে কুমেরুতে সফল ভারতীয় অভিযানের পর তৃতীয়বার ভারতের একদল বিজ্ঞানী এম. ভি. ফিনপোলারিস নামে বিশেষভাবে নির্মিত ফিনল্যাণ্ডের এক জাহাজে চড়ে কুমেরুতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন এবং সেখানে স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলছেন। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গেছেন কুমেরুতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী নানা সাজসরঞ্জাম সহ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিমানও নৌবাহিনীর হেলিকপটার। আমাদের অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের ব্যাপার যে ভারতের কুমেরু অভিযানে অন্যতম অভিযাত্রী হলেন প্রখ্যাতা ভূতত্ত্ববিদ ডক্টর সুদীপ্তা সেনগুপ্ত। তিনিই প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি কুমেরুতে পদার্পণ করলেন। তিনি পর্বতাভিযানেও সুদক্ষ, তিনি বাঙালী মহিলা পর্বত-অভিযাত্রীদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কয়েকটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা 'আণ্টার্কটিকা' পড়লে জানা যাবে—এই অভিযানের কথা আর বিস্ময়ে ভরা কুমেরু মহাদেশের নানা রহস্য।

ভারতের তৃতীয় কুমেরু অভিযানে অভিযাত্রী বিজ্ঞানী দলে ছিলেন ৮০ জন। তাঁরা ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৩ গোয়ার মারগাঁও বন্দর থেকে যাত্রা করেন। ২৪ দিন একটানা সমুদ্র যাত্রার পর অভিযাত্রীদল ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩ কুমেরুর উপকূলে জাহাজে পেঁছান। এই ২৪ দিনের মধ্যে অভিযাত্রীদলের জাহাজ তেল নেবার নেবার জন্য মরিশাস দ্বীপে কিছু সময়ের জন্য থেমেছিল। তাছাড়া একটানা সমুদ্রের বুকে চলেছিল। অভিযাত্রীদল মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে কুমেরুতে তাঁদের মূল শিবিরে একটি উপগ্রহ যোগাযোগ কেন্দ্র ও একটি হেলিকপটার অবতরণক্ষেত্র হেলিপ্যাড নির্মাণ করেন। তৃতীয় অভিযানেই দিল্লীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়। ২১ মার্চ ১৯৮৪ অভিযাত্রী দলের ৬৮ জন সদস্য গোয়াতে ফিরে আসেন। বাকি ১২ জন কুমেরুতে আরও কিছুদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি করে পদে ফিরছেন। তৃতীয় অভিযানে কুমেরুতে ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, আবহবিজ্ঞান ও সমুদ্র বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়।

———



যে দেশের মানুষ লাল



আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে আমাদের দেশে যখন ইংরেজ বণিকেরা আসতে থাকে, তখন তাদের দেখে আমাদের দেশের মানুষ তাদের বলত—লালমুখো মানুষ। ইংরেজদের গায়ের রঙ অনেকটা লাল, মাথার চুল তো লাল বটেই। তাই সাধারণ মানুষ তাদের লালমুখো মানুষ বলত।

আমেরিকা আবিষ্কারক খ্রীস্টোকার কলম্বাস ছিলেন পনের শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একজন দুঃসাহসী নাবিক অভিযাত্রী। স্পেন দেশের রাণী ইসাবেল্লার অনুগ্রহে কলম্বাস ১৪৯২ সালে প্রথম অভিযান করেন, তারপরে আরও তিনটি অভিযান করেন। ভারতসহ প্রাচ্য দেশ আবিষ্কারই ছিল কলম্বাসের উদ্দেশ্য।

কলম্বাস অভিযানে গিয়ে ভেবেছিলেন যে তিনি বুঝি ভারতেই পৌঁছেছেন। কলম্বাসের এই ভুল ধারণা অনুসারে এখানকার উপজাতিরা রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত। এখানকার উপজাতিদের গায়ের রঙ লাল। তাই তারা লাল মানুষ। তবে তাদের গায়ের রঙ ঠিক লাল নয়, চকচকে তামার রঙের মতো লালচে। তাই হয়তো কলম্বাস আমেরিকার এই উপজাতিদের বলেছিলেন—রেড ইণ্ডিয়ান—লাল ভারতীয়।

লাল ভারতীয়রা উপজাতি। তাদের পুরুষদের বিশাল দশাসই বলিষ্ঠ চেহারা। পোশাক ও তাদের বিচিত্র জ'াকালো। পোশাকে নানা রঙের বাহার। পায়ে চামড়ার বাহারে রঙীন জুতো হাঁটু পর্যন্ত। গায়ে ঝলর-লাগানো চামড়ার কোট আর চামড়ার পায়জামা। মাথায় পালকের মুকুটের মতো টুপি যেন পেখম ছড়ানো ময়ুর। গলায় তাদের নানা চাকতির আর পুঁতির মালা। মেয়ে পরে পশমী সায়া, গায়ে চামড়ার পোশাক গলায় পুঁতির আর চাকতির মালা, কানে মাকড়ি। তাদের দেশে শীত বেশি, তবে জমা শীত নয়। সবুজ ঘাস আর নানা গাছগাছালির দেশ।

এদেশের বনে আছে বুনো মোষ। তাদের নাম বাইসন। লাল-ভারতীয় উপজাতিরা বাইসন শিকার করে। লাল-ভারতীয় পুরুষেরা ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্যে গিয়ে বাইসন শিকার করে।

তাদের ঘরবাড়িও বিচিত্র। তাঁবুর মতো। কাঠের খুঁটির কাঠামোর উপর চামড়ার আর মোটা কাপড়ের চাল। দেওয়ালও মোটা কাপড়ের। দেওয়ালে তাদের শিকারের দৃশ্য আঁকা। তাদের এই ঘরবাড়ির নাম উইগাম।

তাদের পুরুষেরা বাইসন ছাড়া অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ও পাখি শিকার করে। তাদের অস্ত্রশস্ক হল তীর-ধনুক আর মল্লব-বর্শা। এইসব অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই তারা শিকার ক্ষরে। তারা নৌকায় মাছ ধরে, মাছ শিকার করে। তাদের নৌকাও বিচিত্র। কাঠ আর চামড়ায় তৈরি নৌকা। নৌকার সরু গলুই নেই। নৌকার দুদিকই চ্যাপটা ধরণের। খুব মজবুত। তাদের পুরুষেরা এই নৌকা তৈরি করে।

তাদের মেয়েরা খুব পরিশ্রমী। তারা শুধু সংসারের যাবতীয়

কাজই করে না, গরু চরায়। তাদের প্রত্যেক পরিবারেই আছে পোষা গরুর পাল। গরু তাদের গৃহেই পালিত হয়। এছাড়া, তাদের মেয়েরা বাঁশ-বেতের আর কাঠের ঝুড়ি তৈরী করে। মেয়েরা মাদুরও বোনে। তাদের মাদুর দেখতে খুব ভাল।

লাল-ভারতীয় উপজাতি মানুষেরা নানা রঙের জমকালো জিনিস পছন্দ করে। তাই তাদের ঘরবাড়ির দেওয়াল, পোশাক, মাদুর, নৌকাতে দেখা যায় নানা রঙের শোভা।

মাছ-মাংস তাদের প্রিয় খাবার। এখানকার নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তারা ছিপেও মাছ ধরে। তবে তাদের বড়শি হল বাইসনের হাড়ের তৈরি। তারা খায় গরুর দুধ, মাখন, ঘি ও অন্যান্য দুধজাত খাবার। গরুর পাল তো তারা বাড়িতেই পোষে।

তারা হল উপজাতি। তাদের মধ্যে সর্দার প্রথা প্রচলিত। এখানে আছে নানা উপজাতির দল। তাদের এক একজন করে সর্দার।

রাতে তারা বসায় নাচগানের আসর। পরিবারের সকলে দলবেঁধে নাচগান করে। দলের সর্দার এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তারা নানা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। বাদ্যযন্ত্রগুলি তারা নিজেরাই তৈরি করে চামড়া, কাঠ আর সরু-মোটা নানারকম তার দিয়ে।

আজকাল অবশ্য নীল মানুষেরা আর আদিম ও সেকালের যুগে নেই। আধুনিক কালে তাদের জীবনযাত্রাও পালটে গেছে।

কিন্তু, আমেরিকার অধিবাসী হওয়া সত্বেও আজও তাদের পরিচয় —রেড ইণ্ডিয়ান—লাল ভারতীয়।

———



কেনিয়া।

পৃথিবীর মহাদেশ আফ্রিকার একটি দেশ। আফ্রিকার পূর্বসীমান্তে অবস্থিত। কেনিয়ার উত্তরে হাবসী-আবিসিনীয়দের দেশ ইথিওপিয়া, দক্ষিণে তাঞ্জানিয়া, পূর্বে সোমালি ও ভারত মহাসাগর আর পশ্চিমে সুদান, উগাণ্ডা আর ভিক্টোরিয়া হ্রদ। কেনিয়ার সীমান্তে আছে আগ্নেয়গিরি পর্বতশৃঙ্গ কিলিমাঞ্জেরো, প্রায় কুড়ি হাজার ফুট উঁচু।

কেনিয়া হল তৃণভূমি অঞ্চল—সবুজ সজীব বড় বড় ঘাসের দেশ আর নানা গাছ গাছালি। তৃণভূমি অঞ্চলে আছে হরিণ, জিরাফ, গণ্ডার, জেব্রা, বাইসন, ঘোড়া, মোষ আর নূ। মোষ-ষাঁড়ের মতো বাঁকানো শিং যুক্ত কিন্তু ঘোড়ার মতো দেখতে। ঘাড়ে-লেজে বড় বড় লোম, মুখে দাড়ি। নূ এক ধরনের বন্যজন্তু। কেনিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলের এইসব প্রাণীরা সকলেই তৃণভোজী আর দ্রুতগামী। তাদের মাংস খায় মাংসাশী সিংহ, চিতা, নেকড়ে আর হায়েনা।

তাই কেনিয়া হল হরেকরকম জীবজন্তুর দেশ। একদল জীবজন্তুর আহার নিরামিষ। তারা হল তৃণভোজী। তাদের খাবার হল ঘাস। আবার আর একদল জীবজন্তু মাংসাশী। তারা এই তৃণভোজী জীবজন্তু ধরে খায়। পাশাপাশি তারা বাস করে একই ঘাসের বনে। বড় বড় ঘাস। তার ভিতরে লুকিয়ে থাকে পশুরাজ সিংহ। ঘাস খেতে যেই তৃণভোজী প্রাণীরা আসে তখন চক্ষের নিমেষে সিংহ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর ঘাড় মটকে খায়। শুধু সিংহ নয়, চিতা, নেকড়ে আর হায়েনারাও আছে। ঘাসের আড়ালে নিঃশব্দে এমনভাবে তারা থাকে যে তৃণভোজী প্রাণীরা তাদের বুঝতেও পারে না।

চিড়িয়াখানায় জিরাফ, জেব্রা দেখা যায়। তারা হল কেনিয়ার জন্তু। জিরাফের মস্ত বড় লম্বা গলা গায়ে ছোপ। বড় উঁচু গাছের পাতাও জিরাফ তাই খেতে পারে। জেব্রা হল গাধার মতো দেখতে, কিন্তু তাদের সারা গায়ে সাদা কালো ডোরা কাটা। কলকাতায় বড় বড় রাস্তায় জেব্রার গায়ের সাদা কালো ডোরাকাটা চিহ্নের মতো আঁকা থাকে—এই জায়গা দিয়ে পথচারীরা রাস্তার এপার—ওপার যাতায়াত করতে পারে। তাই রাস্তার এই অংশকে বলে জেব্রা।

কেনিয়ার এই তৃণভূমি অঞ্চলের এক উপজাতিদের নাম মাসাই। তাদের গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, মাথার চুল ছোট ও কোঁকড়ানো। তারা ছোট ধুতি পরে, সাদা চাদর বুকের একদিকে জড়ানো থাকে। তারা শিকারী জাতি। তাদের বর্শার ফলা হল বেশ লম্বা। তাদের হাতে থাকে প্রকাণ্ড ডিমের মতো আকারের চামড়ার ঢাল, তার গায়ে রঙবেরঙের আঁকা দাগ আর ছবি। তারা মাথায় পরে পালক লাগানো টুপি, যেন ময়ূর পেখম তুলে আছে। তারা সকলেই বলিষ্ঠ চেহারার

মানুষ। তারা দলবেঁধে সিংহ শিকার করে। তাদের মেয়েরা চামড়ার ঘাঘরা পরে। ছেলেমেয়ে সকলেই গলায় পরে লোহার তার জড়ানো হার, তাতে ঝোলে অনেক ছোটবড় চাকতি। সারা বুক জুড়ে থাকে এই হার। হাতে তাদের তারের অনেক বালা, তাদের এই বালার নানা রঙ। কানে তারের মাকড়ি, নাকে নাকছাবি।

তাদের ঘরবাড়িও বিচিত্র। প্রায় মাটি পর্যন্ত ঘরের চাল—আমাদের গ্রামের ধান রাখবার গোলাঘরের মতো। জানলা নেই, শুধু একটিমাত্র ছোট দরজা। দেওয়াল খুব ছোট। বাঁশের বেড়ার দেওয়াল, তাতে কাদা লেপা। ঘরের চাল খড়ঘাসে ছাওয়া। ঘরে আলো ঢোকে না, খুব অন্ধকার। তারা উনুন তৈরি করে বড় বড় খণ্ড দিয়ে। কাঠ-খড়কুটো জ্বালিয়ে তারা রান্না করে।

তারা গরু পোষে। গরুর পাল তারা রাখে ঘেরা জায়গায়—কাঁটা গাছের উঁচু বেড়ার মধ্যে। কারণ, খোলা জায়গায় বা গোয়াল ঘরে গরুর পাল রাখলে সিংহ, চিতা, নেকড়ে, হায়েনারা এসে গরু ধরে খায়। রাতে তারা পাহারাও দেয় এই কারণে। কিন্তু, তার মধ্যেই সুযোগ পেলে চিতা বাঘ গরু ধরে নিয়ে যায়। তাদের এক একটি পরিবারে কয়েকটি করে ঘর, উঠান আর গরু রাখবার জায়গা। তাদের প্রত্যেকের ঘরবাড়ির এলাকাও কাঁটা গাছের উঁচু বেড়ায় ঘেরা।

গরুর দুধ আর নানা পশুপাখির মাংস তাদের প্রিয় খাবার।

যে দেশে আছে বেদুইন



ধুধু বালিময় মরুভূমির দেশ আরব।

এদেশের যাযাবর জাতি হল বেদুইন। এদেশে অন্য কোন জীব-জন্তু নেই—একমাত্র উট ছাড়া। উট হল মরুভূমির জাহাজ। বেদুইনেরা উটের পিঠে চড়ে বেড়ায়। আরব হল উটের দেশ। বালিতে উট ছাড়া আর কোনও প্রাণী চলতে পারে না। উটই হল দেশে মরুভূমি অঞ্চলের একমাত্র বাহন।

জল হল জীবন। জল না খেয়ে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। কিন্তু উট কয়েকদিন জল না খেয়েও বাঁচতে পারে। শুধু জল নয়, উট কয়েকদিন খাবার না খেয়েও চলতে পারে। উটের পিঠে আছে প্রকাণ্ড কুঁজ। এই কুঁজের ভিতর উট খাবার জমা রাখে আর পেটের ভিতর জমা করে রাখে জল। তাই উট কয়েকদিন জল আর খাবার না খেয়ে চলতে পারে, তখন তারা তাদের কুঁজে জমা খাবার আর পেটে জমানো জল খায়। উটের চার পা হল চ্যাপ্টা। বালিতে বসে যায় না। উটের খাবার হল কাঁটাগাছ। মরুভূমিতে কিছু কাঁটাগাছ দেখা যায়। উট এই কাঁটাগাছ চিবিয়ে খায়। তাদের মুখ খুব শক্ত কঠিন, তাই কাঁটাগাছে তাদের মুখ কেটে যায় না।

মরুভূমিতে মাঝে মাঝে দেখা যায় মরুঝড়। গরমকালে নদীর ধারে বালির চরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যদি হটাৎ ঝড় ওঠে তাহলে নাকে মুখে চোখে কানে সারা দেহে বালি লেগে গিয়ে কি অসুবিধায় না পড়তে হয়? নাক মুখ চোখ কান সারা দেহ তখন গরম বালিতে জ্বলে পুড়ে যায়। আর ধুধু মরুভূমির বালির ঝড়—ভয়ানক ব্যাপার। মরুভূমিতে এই ঝড়ের মুখে পড়লে কেউ আর বাঁচে না। উট মরুভূমিতে মরুঝড় উঠবার আগেই বুঝতে পারে। উট সঙ্গে সঙ্গে বালির ভিতর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ঝড় থেমে গেলে উঠে আবার চলতে থাকে।

উটের পাতা বেশ লম্বা-চওড়া। উটের চোখের পাতাই তাদের চোখকে রোদ আর বালি থেকে আড়াল করে রাখে। মরুভূমিতে চলাফেরা করতে উটের কোন অসুবিধা হয় না, তারা সহজেই চলে।

দেশটাও খুব মজার। দিনের বেলায় খুব গরম। রোদের তেজ খুব, বালি তেতে যায়—খালি পায়ে হাঁটা যায় না। আবার রাতে শীত-গরম চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমাতে হয়।

এই দুর্গম দুস্তর মরুভূমি অঞ্চলেই বাস করে বেদুইনেরা। বিচিত্র তাদের পোশাক। তাদের অদ্ভূত পোশাকই তাদের বেদুইন বলে দেয়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রায় সবই ঢোলা কাপড়ের পোশাকে তাদের দেহ ঢাকা। তারা জুতো পায়জামা পাঞ্জাবী কোট পরে। মাথা ও মুখের বেশির ভাগ অংশে সাদা কাপড় জড়ানো থাকে। মরুভূমির গরম দেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও বেদুইনেরা রোদের হল্‌কা যাতে চোখে মুখে দেহে না লাগে তার জন্যই এমন ঢাকা পোশাক। আলখাল্লা ধরণের পোশাক। মরুঝড়ের সময় তারা এই

লম্বা ঢিলা পোশাকের আড়ালে ও মাথার সাদা চাদরে মুখ ঢেকে থাকে।

বেদুইনদের প্রত্যেকের হাতে থাকে শক্ত লাঠি। উটের পিঠে চড়ে তারা চলে। তারা একা একা চলে না। উঠের পিঠে চড়ে সার বেঁধে মরুভূমিতে চলে। উটের পিঠে দুপাশে ঝোলানো বস্তা বা বাক্সবন্দী মালপত্তর। বেদুইনেরা মরুভূমির নানা দেশে এইসব মালপত্তর বেচাকেনা করে। আফ্রিকার সুবিস্তৃত সাহারা মরুভূমির নানা দেশে তারা এইভাবে চলাফেরা করে। রোদের মধ্যে তারা মরুভূমিতে চলে, রোদে-তাপে পুড়ে যায় তাদের দেহ। তাদের দেহের রঙও তামাটে হয়ে যায়।

মরুভূমিতে মাঝে মাঝে আছে মরুদ্যান। মরুভূমি জল-উদ্ভিদ শূণ্য বালুকাময় স্থান হলেও মরুদ্যানে আছে গাছপালা আর জলাশয়। লোকবসতিও আছে। এখানে বালির নিচে আছে জল, তাই কুয়ো খুঁড়ে জল বের করা হয়। বালির নিচে জল থাকায় এখানে কিছু গাছপালাও হয়। এখানে খেজুর গাছ প্রচুর জন্মায়। মরুভূমির দেশের ফলই হল খেজুর। অন্য ফলমূল হয় না। এছাড়া, এখানে নানা কাঁটাগাছ হয়। যাযাবর বেদুইনেরা এই সব মরুদ্যানে মস্ত বড় তাঁর খাটিয়ে সাময়িকভাবে বাস করে। তাঁবু কম্বলের তৈরি। উট ও ছাগলের লোমে এই কম্বল তৈরি হয়।

বেদুইনদের প্রিয় খাবার হল পাকা খেজুর—যা এখানে প্রচুর জন্মায়। এছাড়া, বেদুইনেরা খায় উটের দুধ।

মরুভূমিতে আছে মরীচিকা। মরুভূমিতে দিনের বেলায় সূর্যের কিরণে দূর থেকে বালুকাময় স্থান। এমন চিকচিক করে মনে হয় সেখানে বুঝি জলাশয় আছে, পরে কাছে গিয়ে ভুল ভেঙ্গে যায়। মরুভূমিতে সূর্যকিরণে জলভ্রমকে বলে মরীচিকা। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিক জলের জন্য মরীচিকার আকর্ষণে গিয়ে জল না পেয়ে তৃষ্ণায় অনেকের মৃত্যু ঘটে।

মরুভূমিতে উট আর বেদুইনেরা ছাড়া অন্য কেউ চলতে পারে না। জলতৃষ্ণায় মৃত্যু অবধারিত। মরুভূমিতে শুকনো গরম আবহাওয়ায় বালির মধ্যে দিয়ে চললে জলতৃষ্ণা খুব পায়। বেদুইনদের মরুভূমিতে চলাফেরা করা শিশুকাল থেকেই অভ্যাস হয়ে যায়। তাছাড়া, বেদুইনেরা উটের পিঠে চামড়ার থলিতে জল বোঝাই করে নিয়ে মরুভূমিতে চলাফেরা করে।

মেঘদেশ পৃথিবীর ছাদ



ঘরবাড়ির ছাদ হল উঁচু জায়গা। পৃথিবীর ছাদ হল পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা। তিব্বত হল পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গার দেশ, যেখানে মানুষের বসতি আছে। তাই তিব্বতকে বলা হয় পৃথিবীর ছাদ।

হিমালয়ের উত্তরে এই দেশ তিব্বত। সুউচ্চ মালভূমি অঞ্চল। পাহাড়ে ঘেরা পাহাড়ের দেশ। দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য দেশ—এই দেশে যাওয়া বা লঙ্ঘন করা এককালে ছিল দুঃসাধ্য। তিব্বতের উত্তরে বরফে ঢাকা মালভূমি, পশ্চিম ও দক্ষিণে কারোকোরাম ও হিমালয় পর্বতমালার গভীর গহণ অরণ্য, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের নদী উপত্যকা আর উত্তর-পর্বতসংকুল ও গভীর নদীখাতপূর্ণ অঞ্চল। তিব্বত হল এশিয়া মহাদেশের বহু নদী-উপনদীর উৎসস্থল। তিব্বতে আছে বহু হ্রদ। তাই তিব্বতে গমনাগমন আজও সহজসাধ্য নয়।

এদেশের অধিবাসীরা হল তিব্বতী। পশুপালন তাদের প্রধান জীবিকা। চমরী গাই, ভেড়া ও ছাগল তারা পোষে। চমরী গাই হল

ঘোষের মতন দেখতে। তার সারা গায়ে বড় বড় লোম। এই লোমেই তিব্বতীরা চাদর-গালিচা-কম্বল প্রভৃতি তৈরি করে। এছাড়া, তারা ছাগল-ভেড়ার লোমেও এসব তৈরি করে।

তিব্বতীদের চমরী নির্ভর জীবন। চমরী ষাঁড় তাদের চাষবাসে লাঙ্গল টানে। চমরীর পশম তাদের বয়নশিল্পের প্রধান উপাদান। চমরী গাই-এর দুধ তারা খায়। তারা খায়ও চমরীর মাংস। চমরীর চামড়ায় তারা কম্বল বানায় ও নানা কাজে লাগায়।

তিব্বতীরা বৌদ্ধ। তাদের প্রত্যেকেরই বাড়িতে আছে সুসজ্জিত পূজার স্থান বা বেদী। সারা তিব্বতে আছে নানা মঠ, মন্দির আর স্মৃতিস্তম্ভ। তিব্বতীরা ছবি আঁকতে পারে, পাথর ও ধাতুর মূর্তি তৈরি করতে পারে—এগুলি তিব্বতী লোকশিল্পের অসামান্য নিদর্শন। তারা কাঠ খোদাই ছাপতে পারে। এছাড়া, তাদের তৈরি গালিচা ও কাঠের কাজ খুব সুন্দর। তারা পশমের কম্বল ও গরম নানা পোশাকাদিও তৈরি করে।

তিব্বতীদের পোশাকও বিচিত্র। রঙবেরঙের ভারী জাঁকালো পোশাক তারা পরে। পশমের তৈরি মস্ত বড় আলখাল্লা, পায়জামা ও টুপি পরে। তাদের গায়ে থাকে শীত আটকাবার জন্য গরম পোশাক।

তিব্বতীদের ঘরবাড়িও বিচিত্র। তিব্বতীদের গ্রামে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে—উঁচু পাহাড় ধাপে ধাপে কেটে সেখানে বাড়ি তৈরি করে তারা বাস করে। পাথরের বাড়ি। কাঠেও তৈরি। জানলা ছোট। একটিমাত্র ছোট দরজা।

শীতপ্রধান দেশ তিব্বত। তিব্বতীরা রোজ স্নান করে না। রোজ পোশাক পালটায় না। একই পোশাক পরে থাকে অনেকদিন ধরে।

ফলে তাদের পোশাক ময়লা হয়ে যায়। গায়েও তাদের দুর্গন্ধ—স্নান না করার জন্য। তিব্বতী মেয়েরা ডোরাকাটা ঘাঘরা পরে। তাদের হাতে অনেক চুড়ি, গলায় মালা, কানে মাকড়ি তৈরি করে।

তিব্বতে চা উৎপাদিত হয়। চা তাদের প্রিয় পানীয়। দুধ-চিনির বদলে মাখন-নুন দিয়ে তৈরি করে তারা চা খায়। আমরা তিব্বতীদের চা পান করতে পারব না, খেলেই বমি হয়ে যাবে। অথচ, তিব্বতীদের এই নুন-মেশানো চা পান করতে কোনও অসুবিধা হয় না।

———



যে দেশে বাস করে বামনেরা

প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক জোনাথন সুইফ্‌ট (১৬৬৭—১৭৪৫ সাল) লিখিত 'গ্যালিভারস ট্র্যাভেলস্' ইংরেজি রূপকথা ধরণের গল্পের বইতে বামনদের কথা আছে। এ শুধু গল্প কাহিনী নয়, বাস্তবে ও আজব দুনিয়ায় এমন দেশ আছে—যেখানে বাস করে বামন-মানুষেরা।

কঙ্গো।

আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমে গিনি উপসাগর আর দক্ষিণ আটলানটিক মহাসাগরের কোলঘেঁষা ছোট্ট একটি দেশ। কঙ্গো নদীর উপত্যকা অঞ্চল। কঙ্গো নদীর ধারে গভীর গহন বন। বিচিত্র এখানকার জলবায়ু। রোজ সন্ধ্যা না লাগতে লাগতেই নামে মুষলধারে বৃষ্টি। থামতে আর চায় না। তাই, এখানকার আবহাওয়া স্যাঁতসেতে। বনভূমি সব সময়েই থাকে ভেজা, কাদামাখা। অথচ দুপুর বেলায় বৃষ্টি হয় না, বেশ খটখটে আবহাওয়া। আর খুব গরম। সূর্য যেন ঠিক মাথার উপর, দারুণ রোদ। এখানকার ঘন বন লতাপাতা আর গাছ-

গাছালিতে ঘেরা। এই বনে চলাফেরা করা কঠিন, লতাপাতায় হাতপা জড়িয়ে যায়। এখানকার গাছে গাছে রঙবেরঙের কত পাখি।

কিন্তু এই বনে আছে নানা বন্য জীবজন্তু। নানা ধরণের বিষধর সাপ ছাড়া আছে নানা বিষাক্ত সরীসৃপ (বিছা, গিরগিটি, জোঁক প্রভৃতি। এছাড়া, আছে বাঘ ভালুক, গণ্ডার, হাতী আর সাদা ধবধবে দাঁত বের করা বন্য শুয়োর। গাছে আছে বাঁদর, হনুমান, শিম্পাঞ্জী আর গরিলা। কঙ্গো নদীতে আছে কুমির আর জলহস্তী। জলে বা ডাঙ্গায় এ বনাঞ্চলে ঘুরলে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা দায়। পদে পদে এখানে মৃত্যুর হাতছানি।

কিন্তু এই বনেই বাস করে বামনেরা—বেঁটেখাটো বামন মানুষেরা। গ্যালিভারের ভ্রমণ কাহিনীর লিলিপুটদের মতো। ঘন কালো তাদের গায়ের রঙ। গায়ে কোনও পোশাক নেই। শুধু দেহের নিচের দিকে নেংটি তারা পরে। এই বামন-মানুষদের বলে পিগমি। তারা আফ্রিকা মহাদেশের আদিম উপজাতি। এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় গাছ কেটে খানিকটা ফাঁকা করে নিয়ে সেখানে ঘরবেঁধে তারা বাস করে।

তাদের ঘরবাড়িও বিচিত্র। নৌকার বা গরুর গাড়ির ছই-এর মতো দেখতে তাদের বসবাসের ঘর। গাছের বড় বড় শুকনো পাতা, ছাল, লতাপাতা দিয়ে তাদের এই ছই-ঘর তৈরি। উপরে ও নিচে থাকে আঠালো কাদামাটি দিয়ে এমনভাবে লেপা থাকে যাতে বৃষ্টিতে ধুয়ে গলে যায় না। ঘরের দরজা-জানলা নেই। সামনের দিকে ফাঁকা সেখান দিয়েই তারা ঘরে ঢোকে। মেঝেতে শুকনো পাতা বিছানো। তার উপরেই তারা থাকে।

বনের নানা ফল তারা খায়। এ বনে বেশ কলাগাছ হয়। কলা তাদের প্রিয় খাবার।

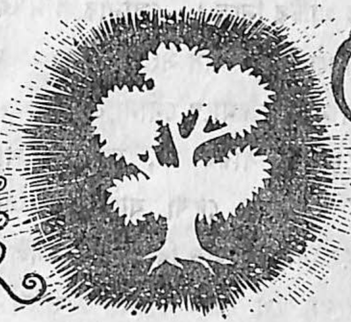
পিগমিরা শিকারী। তীর ধনুক বর্শা দিয়ে তারা শিকার করে। তাদের তীরে মাখানো থাকে বিষ। বনে শুয়োর শিকার করে তারা তার মাংস আগুনে ঝলসিয়ে-পুড়িয়ে খায়। তারা রান্না করা খাবার খায় না। তারা এখনও আদিম যুগেই বাস করে।

তারা তাদের বিষ মাখানো তীরে হাতী পর্যন্ত শিকার করে। হাতীর দাঁত তারা সভ্য শিক্ষিত মানুষদের দেয়। বিনিময়ে পায় তারা তাদের হাতিয়ার—লোহার ছোরা, ছুরি, বর্শার ফলক, কাটারি আর পুঁতির মালা, টুপি।

তারা মাঝে মাঝেই ধামসা জাতীয় চামড়ার তৈরি প্রকাণ্ড বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দলবেঁধে নাচগানের আনন্দ উৎসব করে।

———

যে দেশে আছে সোনার গাছ



সোনার গাছ!

শুনতে অবাক লাগে—ভাবতে লাগে মজা।

তবে রূপকথার সোনার গাছ নয়। আজব দুনিয়ায় এমন দেশও আছে—যেখানে আছে সোনার গাছ।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা হালে মধ্য এশিয়ার সোনার খনি এলাকায় সোনার গাছের খোঁজ পেয়েছেন। এই গাছের পাতায় আছে সোনা। তাই বলে সোনার গাছের পাতার রং সোনার মতো নয়, সাধারণ সব গাছের পাতার মতোই সবুজ। হিসাব করে দেখা গেছে যে এক টন ওজনের এই সবুজ পাতা থেকে সোনা পাওয়া গেছে দশ-এগারো গ্রাম। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সবুজ পাতা থেকে নিষ্কাশন করে বের করা সার হল সোনা। তাই বিজ্ঞানীরা এই গাছের নাম দিয়েছেন সোনার গাছ।

কেন এই গাছের পাতা নিষ্কাশন করলে পাওয়া যায় সোনা? আমাদের অজানা নয় যে উদ্ভিদ তার শিকড়ের সাহায্যে মাটির

নিচের রস সংগ্রহ করে। সেই রস তারা জমা করে গাছের পাতায়। পরে আলো আর বাতাসে সেই রসই হয় গাছের খাবার।

সোনার খনি থাকে মাটির নিচে। সোনার খনি এলাকায় যে গাছ জন্মায় সে গাছ মাটির নিচে খনিজ রস সংগ্রহ করে। তার ফলেই এই গাছের পাতায় খুব সামান্য পরিমাণে সোনা এসে জমা হয়। আমরা এই পাতায় সোনা দেখতে পারব না, বুঝতেও পারব না। তবে বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা যাবে যে এই পাতায় আছে সোনা। আমরা বুঝতে না পারলেও বিজ্ঞানীরা খালি চোখে এই পাতা দেখলেই বুঝতে পারেন যে এই পাতায় সোনা আছে। রুশ বিজ্ঞানীদের এই মহৎ আবিষ্কারের ফলে খুব সুবিধা হয়েছে। কোনও গাছের পাতায় সোনার খোঁজ পাওয়া গেলেই বুঝতে পারা যাবে সেখানে মাটির নিচে আছে সোনার খনি।

রুশ বিজ্ঞানীরা এই সোনার গাছের দেশে গড়ে তুলেছেন পরীক্ষা নিরীক্ষার নানা গবেষণাগার।



যে দেশে গাছ পাখি ধরে

পাখি গাছে বাসা বাঁধে। পাখি গাছের ডালে ডালে খেলে বেড়ায়, গাছে উড়ে এসে বসে। গাছের ফলও খায় পাখি। কিন্তু আজব ছুনিয়ায় এমন দেশও আছে—যেখানে গাছ পাখি ধরে। পাখির মৃত্যু ঘটায় গাছ। এমন ভয়ানক গাছের দেশ হল নিউজিল্যাণ্ড।

নিউজিল্যাণ্ড। একটি ছোট্ট দ্বীপের নাম। দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ নেই বললেই চলে। অর্থাৎ দ্বীপটি হল লম্বা।

অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকে এই দ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এই অবস্থিতি। এই দ্বীপের পশ্চিমে তাসমান সাগর। দ্বীপের দক্ষিনে দক্ষিণ মহাসাগর। উত্তর দ্বীপ ও দক্ষিণ দ্বীপ—এই ছুটি দ্বীপ নিয়ে নিউজিল্যাণ্ড।

নিউজিল্যাণ্ডের উত্তরদ্বীপের একটি অংশ অকল্যাণ্ড। এখানকার বনাঞ্চলে এক ধরণের গাছ আছে—যে গাছ পাখি ধরে। পাখির মৃত্যুর জন্য এই গাছ দায়ী।

এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম—'পিসকোনিয়া ব্রুনোনিয়ানা।' কিন্তু গাছের এই নাম লোকে বলে না। সেখানকার অধিবাসীরা এই গাছকে বলে ব্রাউন ট্রি। এই গাছের পাতার রঙ পিঙ্গল কটা কপিল। তাই লোকে বলে ব্রাউন ট্রি। চির-হরিৎ বা হরিতাভ এই গাছগুলি হয় বেশ লম্বা। একতলা থেকে তিনতলা সমান উঁচু। গাছের পাতাও খুব সরু আর লম্বা। সারা বছর ধরে এই গাছে হলুদ রঙের ফুল ফোটে। অকল্যাণ্ড দ্বীপের বেশ উঁচু জায়গায় এই গাছ জন্মায়।

এই পাখি-ধরা গাছের ফল আমাদের পরিচিত ও সকলেরই দেখা ফল ঝিঙের মতো। লম্বা লম্বা ফল প্রচুর গাছে ফলে। ঝিঙের মতোই ফলের গায়ে লম্বা খাঁজ থাকে, প্রত্যেক ফলে পাঁচটি করে খাঁজ। ঝিঙের মতো তেতো ফল নয়, মিষ্টি ফল। ফল পাকলে আপনা থেকেই ফেটে যায়। ফলের ভিতর থাকে ছোট ছোট দানা। এই দানা থেকে এক ধরণের আঠা বের হয়। পাখিরা ফল খেতে এই গাছে বসলেই দানার আঠালো রসে পাখির ডানা আটকে যায়। পাখি ডানা বা পাখা ঝটপট করলেও আঠা থেকে ডানা ছাড়াতে পারে না। ফলের দানার আঠাতেই পাখি আটকে থাকে। ফলে পাখির মৃত্যু ঘটে। পাখি গাছে বসে ফল খেতে শুরু করলেই তার আর মুক্তি নেই, আর উড়ে যেতে পারে না। এই ভাবেই সারা বছর এই গাছের ফলের দানার আঠায় হাজার হাজার পাখির মৃত্যু হয়। তাই গাছে দেখা যায়—অনেক অনেক পাখি মরে ঝুলে আছে। কী ভয়ানক দৃশ্য!

অকল্যাণ্ড অঞ্চলে এই পাখি-ধরা গাছ অনেক আছে। শুধু অকল্যাণ্ডেই এই গাছ নেই, কাছাকাছি অনেক দ্বীপে এবং অস্ট্রেলিয়ার

কয়েকটি অঞ্চলে এই গাছ আছে। তবে, অকল্যাণ্ডের মতো এত বেশি এই গাছ অন্য কোথাও নেই।

পাখি কে না ভালবাসে? পাখিদের এমন মৃত্যু সেখানকার মানুষ মেনে নিতে পারেনি। এই গাছ কেটে ফেলার জন্য তারা তাদের দেশের সরকারের কাছে দাবী করছে। সরকার অবশ্য এই গাছ কেটে ফেলার জন্য তারা তাদের দেশের সরকারের কাছে দাবী করছে। সরকার অবশ্য এই গাছ কেটে ফেলছে না। তবে এই গাছের ফল পাকবার আগেই ভেঙে ফেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ফল পাড়াতেও বেশ অসুবিধা আছে। এই গাছ খুব লম্বা। আর ফল ধরে অনেক উঁচুতে—যেখানে ডালপালা আছে। এই গাছ জ্বালানী ও অন্যান্য নানা কাজে লাগে। বছরে কিছু গাছ কেটেও ফেলা হয়।

*

আজব দুনিয়ায় শুধু পাখি-ধরা গাছই নেই, মাছি-খেকো গাছও আছে। এই গাছ মাছি খেয়ে ফেলে। ইংরেজিতে এই গাছের নাম VENUS FLYTRAP.

আমেরিকার বনাঞ্চলে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

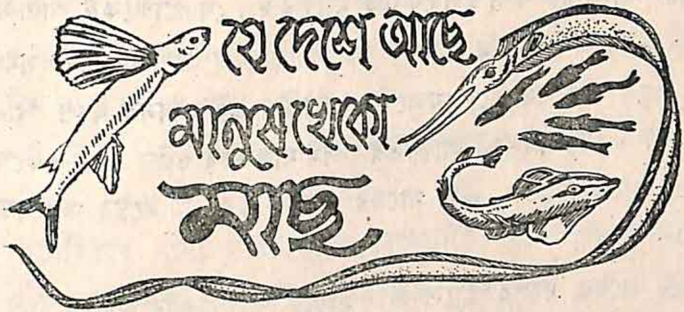
এ গাছের পাতা হল বিচিত্র। বেশ বড় বড় চওড়া ঘন সবুজ পাতা। পাতা দুমড়ানো। দুইধারেই আছে আঁকড়া আর শুঁয়া। পাতার শিরাগুলি ধারালো কাঁটার মতো এবং মাঝে মাঝে প্রসারিত হয়। গাছ নিজের ইচ্ছামত পাতা গুটিয়ে নিতেও পারে, আবার খুলে মেলতেও পারে। যখন পাতা গুটিয়ে নেয়, তখন অনেকটা ফুলের সাজির মতো দেখতে হয়, কলসীর মতোও দেখতে হয়। ছোট ছোট পোকা বিশেষ করে মাছি এই পাতার উপর উড়ে এসে বসলে পাতা

একেবারে গুটিয়ে নেয়। পোকা বা মাছি আটক হয়ে যায়। পাতার এই ফাঁদ থেকে আর বের হতে পারে না পোকা বা মাছি পাতায় চাপেই পাতার মধ্যেই মিলিয়ে যায়। মনে হয় যেন এই গাছ পাতার মধ্যে দিয়ে পোকা মাছি খেয়ে হজম করে ফেলে। তাই এই গাছকে পোকা-খেকো বা মাছি-খেকো গাছও বলা যেতে পারে। তবে এই গাছে পাতা খুব কম হয়।

*

দক্ষিণ আমেরিকায় এক ধরণের সাংঘাতিক গাছ আছে। এই গাছের ফলের তুটি বাঁকানো, ধারালো শিং আছে। কোনও প্রাণী এই গাছের কাছে গেলে এই গাছের ফলের শিং তুটি সেই প্রাণীকে আকড়ে জড়িয়ে ধরে। শিং দেহের মধ্যেও ঢুকিয়ে দেয়, ফলে, অনেক সময় সেই প্রাণী মারাও যায়। গাছ খুব ছোট হয়। এই গাছের ফুল দেখতে খুব সুন্দর। শিং-যুক্ত ফলের এই গাছকে সেখানকার মানুষ 'শয়তানের শিং গাছ।'

দক্ষিণ আফ্রিকার বনাঞ্চলে এক ধরণের গাছ আছে, তার ফলেও আছে অনেক ধারালো বড় বড় নখ। নখে আছে বিষ। যে কোন প্রাণী এই গাছের এলেই এই গাছের ফলেই নখ তাকে জড়িয়ে ধরে, ফলে সেই প্রাণীর মৃত্যু হয়। মানুষ যদি এই ফল খায়, তাহলে গলায় নখ বিঁধে যাবে। মৃত্যুও ঘটবে।



মানুষ মাছ খায়। আবার আজব হুনিয়ায় মানুষ-খেকো মাছও আছে। এই ভয়ংকর হিংস্র মাংসাশী মাছের নাম পিরানহা (PIRANHA) এবং সারাসিড (CHARACID)। তবে আমাদের দেশে এই মাছ নেই। আছে আমেরিকা আর আফ্রিকার সমুদ্র-অঞ্চলে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীতে ও ব্রেজিলের সানফ্রানসিসকো নদীতে এই মাছ দেখা যায়।

মাছের আকার নানা রকম। হুই ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। আকারের পার্থক্য থাকলেও এই মাছেরা সকলেই হিংস্র এবং মাংসাশী। গোলাকার তাদের গঠন। দেহের হুইপাশে থাকে পাখনা। মুখের ভিতর উপর-নিচে আছে সারি সারি করাতের মতো তীক্ষ্ণ দাঁত। ক্ষুরের মতো ধারালো তাদের দাঁত। জলের যে কোন প্রাণীর দেহ থেকে সহজে মাংস কেটে ছিঁড়ি খেতে পারে। এমন কি কুমির, হাঙর ও তিমির মাংসও এই মাছ খায়। মাছের গায়ের রং কালো। এই মাছ একা থাকে না, দলবেঁধে থাকে। এক একটি দলে

সব সময়েই দশ থেকে পনের হাজার মাছ থাকে। তাদের গতি তীব্র। রক্তের গন্ধ পেলেই তীরবেগে হাজার হাজার মাছ সেখানে ছুটে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল যে এই মাছের দল যে প্রাণীকেই আক্রমণ করুক না কেন—একমিনিটেরও কম সময়ে সেই প্রাণীর দেহের সমস্ত মাংস খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। তাদের এই ভয়ানক কাণ্ড কল্পনা করা যায় না। বিশাল আকৃতির তিমি মাছ যার ওজন প্রায় একশো পাউণ্ড—তাকে খেতেও এই মাছের দলের এক মিনিটের কম সময় লাগে।

এই মাছের দলের হাতে প্রাণ হারায় আমেরিকার আদিবাসীরা। মাছ ধরতে জলে নামা মাত্রই মাছের দল হঠাৎ এসে আক্রমণ করে নিমেষেই খেয়ে শেষ করে ফেলে। পরে কেউ এসে তার আর কোন চিহ্নই খুঁজে পায় না।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে আমেরিকার আদিবাসী উপজাতি মানুষেরা এই মাছ ধরে রান্না করে খায়। এই মাছ নাকি বেশ সুস্বাদু। কী করে তারা এই মাছ ধরে? এই মাছ দলবেঁধে চলে। নদীতে এই মাছের দলকে দেখতে পেলেই আদিবাসীরা কৌশলে তাদের উপরে ছুঁড়ে দেয় মজবুত তারের জাল। তারের জাল টেনে উপরে তোলার সময় অনেক মাছ টপকিয়ে আর জাল কেটে বেরিয়ে যায়। কিছু মাছ জালে আটকিয়ে থাকে। তারপর ডাঙায় তুলে তারা সকলে মিলে লাঠি দিয়ে এই মাছ মেরে মুখ কেটে তেলে ভেজে রান্না করে খায়। মাছ ধরার সময় এই মাছ আদিবাসীদের আঙ্গুল কামড়ে দেয়। মানুষের বুদ্ধির কাছে শেষ পর্যন্ত এই মাছ হার মানে। খুব সাবধান ও সতর্কতার সঙ্গে আদিবাসীরা এই মাছ ধরে।

এই মাছ জলের ছোট বড় মাঝারি সব রকমের মাছ খেয়ে ফেলে। তাই এই মাছ যে নদীতে থাকে সেখানে আর অন্য কোনও মাছ থাকে না, থাকতে পারে না। এই মাছ জলজ উদ্ভিদও খায়। এই মাছের দল কখনও নদীর কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে না। শিকারের খোঁজে দলবেঁধে তারা নদীতে ঘুরে বেড়ায়।

এই মাছ ডিম পাড়ে। পাঁচ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

আমেরিকার নানা মৎস্যাগারেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণাদির জন্য এই মানুষ-খেকো মাছ পালন করা হয়ে থাকে।

*

মেঘালয়। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে একটি অঙ্গ রাজ্য। এ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে আছে গাড়ো পাহাড়। গারো পাহাড় মাল-ভূমিতে আছে নানা ছোট ছোট ঝর্ণা-নদী আর হ্রদের মতো ছোট ছোট জলাশয়। এখানে এক ধরণের মাছ আছে, জলে এই মাছের সংস্পর্শে এলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। কী ভয়ানক ব্যাপার? গারো পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীদেরও বলে গারো। গারো ভাষায় এই ভয়ঙ্কর মাছের নাম লনেল। গারো পাহাড়ের দামালগিরি অঞ্চলে আছে গানাউল নামে একটি ছোট পাহাড়ী নদী। নদীতে লনেল মাছ আছে। মানুষ জল খেতে স্নান করতে বা অন্য কোনও প্রয়োজনে এই নদীতে নামলেই লনেল মাছের দল এসে পায়ে জড়িয়ে ধরে, আর তৎক্ষণাৎ মানুষটির মৃত্যু হয়। কী করে এই মৃত্যু ঘটে? তার কারণ হল—লনেল মাথায় আছে পজিটিভ বিদ্যুৎ তরঙ্গ আর লেজে আছে নেগেটিভ বিদ্যুৎ তরঙ্গ। মানুষের পায়ে এই মাছ স্পর্শ করলেই পজিটিভ

নেগেটিভ এক হয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। মানুষ খুব জোরে পায় শক বা ধাক্কা। ফলেই মানুষের সারা দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায়, মানুষের বিদ্যুৎ-পিষ্ট হবার জন্য তার মৃত্যু হয়। তাই এই মাছকে বলা হয় বিদ্যুৎ-মাছ (ELCTRIC FISH)। আসলে এই মাছের সারা দেহে বইছে তীব্র-বিদ্যুৎ-ধারা। এই মাছের জন্য গারো পাহাড়ের অধিবাসীরা অনেকে প্রাণ হারায়।

এই বিদ্যুৎ-মাছের মাথা বেশ চওড়া ও চ্যাপ্টা। মুখের দিকেই দুটি চোখ। সারা গায়ে কালো ডোরাকাটা লম্বা দাগ। মাছের পিছনের দিকের লেজ ও পাখনায় আছে বিদ্যুৎ-প্রবাহ। তবে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত এই মাছের সারা দেহেই বিদ্যুৎ-ধারা রয়েছে। এই মাছের আঁশ ও দেহের তন্তুতে আছে এমন জিনিস—যার ফলেই মাছের দেহে-বিদ্যুৎ-প্রবাহ বর্তমান। এই মাছে গড়ে ২৫০ ভোল্ট শক্তিশালী বিদ্যুৎ আছে। আবার, কোন কোন মাছের ৮০০ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ আছে।

মজার ব্যাপার হল—এই বিষাক্ত বিদ্যুৎ মাছ গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের প্রিয় খাদ্য। তারা এই মাছ কৌশলে ধরে। মাছের মাথা কেটে বাদ দিয়ে দেহের অবশিষ্ট অংশ রান্না করে গারোরা খায়। এই খুব মাছ তৈলাক্ত এবং এই মাছে আছে অনেক পরিমাণে অন্নসার (Protein)।

গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের জনবসতি এলাকায় হাটে-বাজারে এই মাছ তাই খুব বেচাকেনাও হয়।

এই মাছ শুধু ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ী এলাকায় পাওয়া যায় না, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীতেও পাওয়া যায়।

*

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের নদীতে এক ধরণের মাছ আছে—তাদের চার চোখ। এই মাছের নাম অ্যানাস লেপস।

*

মালয়েশিয়া অঞ্চলে এক ধরণের মাছ আছে—যারা গাছে উঠতে পারে। তাদের চোখ ও ডানা বেশ বড়। নদীতে জল নেমে গেলে এই মাছ তীরের গাছে উঠে পোকা-মাকড় খোঁজে আর খায়। এই মাছের নাম—'পেরিথালমাস স্কলোসেনি'।

*

গভীর সমুদ্রের মাছ 'ইল'। সাপের আকৃতি। ইল মাছের দেহেও বৈদ্যুতিক শক্তি আছে।

———



পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বড় পাখি কোনটি ?

—উট পাখি।

কোন পাখির ডিম সবচেয়ে বড় ?

— উট পাখির ডিম সবচেয়ে বড়।

উট পাখির ইংরেজি নাম OSTRISH. আফ্রিকা মহাদেশের নানাস্থানের গভীর বনাঞ্চলে উটপাখি এখনও আছে। অস্ট্রেলিয়াতেও আছে এই পাখি।

উটপাখির মতো আরও বড় বড় পাখি এখন পৃথিবীতে আছে। সেই পাখি গুলি হল : দক্ষিণ আমেরিকার রিয়া (REA), অস্ট্রেলিয়ার কসওয়েরি (COSSWARY) ও এমু (EMU) এবং নিউজিল্যাণ্ডের মোয়া (MOA)।

কিন্তু এইসব পাখিদের তুলনায় আকারে অনেক অনেক বড় এবং যার ডিমও সবচেয়ে বড়—সে পাখি হল এপিয়রনিস (AEPYORNIS).

এপিয়রনিস পাখি আকারে এত বিশাল ছিল যে একটা হাতীকে

ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে আকাশে উড়তে পারত। এই পাখির ডিমও আকারে বিশাল।

মাদাগাসকার বা মালোগাসি দ্বীপ। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগরের বুকে এই দ্বীপের অবস্থান। দ্বীপটির উত্তরে মাথায় ডি. আম্বর অন্তরীপ আর দক্ষিণে নিচে সেণ্ট মেরী অন্তরীপ। দ্বীপটির মাঝখানটা উঁচু, চারদিক নিচু। পশ্চিমে সাভানা অঞ্চল, পূর্বে ক্রান্তিয় চিরহরিৎ উদ্ভিদ অঞ্চল। বিচিত্র এই দ্বীপ। এই দ্বীপে এমন অনেক গাছপালা আর জীবজন্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন —যা পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও নেই। বিজ্ঞানীদের কাছেই শুধু নয়, সকলেরই কাছেই এই দ্বীপ বিস্ময়ে ঘেরা।

মাদাগাসকার দ্বীপেই পৃথিবীর সর্বকালের সর্ববৃহৎ পাখি ও তার ডিমের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই সবচেয়ে বিশাল আকৃতির এপিয়রনিস পাখি কয়েক শো বছর আগেই পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে এই দ্বীপে যে এপিয়রনিস পাখি ছিল, তার প্রমাণ হল—এই পাখির ডিম বা ডিমের ভগ্নাবশেষ আজও পাওয়া যায় এই দ্বীপের বনাঞ্চলে পাহাড়ের পাদদেশে। বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের শেষ নেই এই ব্যাপারে। তাই দেখা যায়, মাদাগাসকারে পৃথিবীর বিখ্যাত প্রকৃতি তত্ত্ববিদেরা গিয়ে এই ডিমের সন্ধান করছেন, সংগ্রহ করছেন পৃথিবীর অবলুপ্ত বিশাল পাখি এপিয়রনিস পাখি সংক্রান্ত নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য।

এই বিশাল পাখির কথা অনেকেই লিখেছেন। আরব্য রজনীর গল্পে এই পাখির বর্ণনা আছে। বিজ্ঞানী-লেখক এইচ. জি. ওয়েলস

তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে মাদাগাসকারের এপিয়রনিস পাখির উল্লেখ করেছেন।

মারকো পোলো (১২৫৪-১৩২৪ সাল) মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত পর্যটক। তিনি শুধু ভারত পরিভ্রমণ করেন নি, সারা পৃথিবীর নানা স্থান পরিভ্রমণ করে লিখেছেন তাঁর পরিভ্রমণ বিবরণ আফ্রিকায় পরিভ্রমণ করে মারকো পোলো এই মহাদেশের নানা তথ্যপূর্ণ বিবরণ লিখেছেন। মাদাগাসকার পর্যটন করে মারকো পোলো এপিয়রনিস পাখির কথা সেখানকার অধিবাসীদের কাছে জানতে পারেন। সেখানকার অধিবাসীরা পোলোকে জানিয়েছিলেন যে এই বিরাট আকৃতির পাখি হাতীকে পর্যন্ত ঠোঁটে নিয়ে আকাশে উড়তে পারে। এই কথা থেকেই পাখিটির বিশাল আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

এপিয়রনিস পাখি সম্পর্কে প্রামান্য বিবরণ লেখেন ফ্ল্যাকোর্ট। তাঁর পুরো নাম Sieur Eitnne de Flacourt. মাদাগাসকার একসময় ছিল ফরাসী উপনিবেশ। ফ্ল্যাকোর্ট ছিলেন একজন ফরাসী। ১৬৪৮ সালে তিনি ছিলেন মাদাগাসকারের শাসনকর্তা। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে বহুদিন আগে মাদাগাসকারের অধিবাসীরা এপিয়রনিস পাখি দেখেছেন কিন্তু এই পাখিকে ধরা যায় নি। নির্জন স্থানে এই ডিম পাড়ে, বিশাল এই ডিম। তারপর থেকেই শুধু হয়—এপিয়রনিস পাখি আর ডিমের জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। ১৮৫০ সালে মাদাগাসকারের এক নির্জন পাহাড়ী এলাকায় পাওয়া যায় এপিয়রনিস পাখির বিরাটাকার ডিম। উটপাখির ডিমের চেয়ে আধগুণ আকারে বড়।

আবার, ১৯৬৩ সালে এখানে পাওয়া যায় এই পাখির ডিমের

অংশ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে এই ডিম এক হাজার বছরের প্রাচীন। এই ডিমের টুকরো থেকে জানা যায় যে ডিমের পাথরের মতো শক্ত আর বেশ পুরু।

আমেরিকার বিখ্যাত প্রকৃতি তত্ত্ববিদ পুইস মারডেন মাদাগাসকার দ্বীপের পশ্চিম অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী বালির চরে এপিয়রনিস পাখির ডিমের খোলার টুকরোর সন্ধান পেয়েছেন। শুধু খোলার টুকরো নয়, মারডেন সাহেব মাদাগাসকার দ্বীপের আনতাদ্রে গ্রামে মিশনারী সাহেব জোসেফ কাইফারের সৌজন্যে গ্রামের মোড়ল ফেনানড্রোর কাছ থেকে এপিয়রনিস পাখির সম্পূর্ণ একটি বিশাল ডিম সংগ্রহ করেন। এই ডিমের সন্ধানেই মারডেন সাহেব মাদাগাসকার দ্বীপে অবস্থান করছিলেন, এতদিনে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা সফল হল এবং প্রমাণিত হল যে এপিয়রনিস পাখিই ছিল পৃথিবীর পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও তার ডিমও পাখিদের ডিমের মধ্যে সবচেয়ে বড়। কিন্তু এই বিরাটাকার পাখি এপিয়রনিস বহুকাল আগেই পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তবু, মাদাগাসকার দ্বীপে চলেছে এই পাখির আর তার ডিমের জন্য অনুসন্ধান।

যে দেশে আছে নানা চমক

ভারতের মূল ভূখণ্ডের পশ্চিমে আরব সাগরের বুকে দ্বীপ মিনিকয়। ভারতের মানচিত্রে এই দ্বীপের অবস্থান একটি বিন্দুর মতো। এই দ্বীপ ভারতের অংশ এবং লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ সংলগ্ন। দ্বীপটি কেন্দ্র শাসিত ভারতীয় অঞ্চল। দ্বীপটি আসলে প্রবাল দ্বীপ। আয়তন মাত্র তিন বর্গমাইল (দৈর্ঘ্যে ছয় মাইল, প্রস্থে আটশো গজ)। একটি পুঁতির মালার মতো দেখতে। মূল ভারত ভূখণ্ডের সঙ্গে স্থল, বা আকাশপথে যোগাযোগ নেই, একমাত্র যোগাযোগ নৌপথে। অপূর্ব সুন্দর এই দ্বীপ। এই দ্বীপে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই সংখ্যাই বেশি এবং সম্পূর্ণভাবে মেয়েরাই এই দেশের সমাজ চালায়। পরিবারে মেয়েরাই প্রধান। বিয়ের পর ছেলেরা মেয়েদের উপাধি নেয়। জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার, তার মধ্যে তিন হাজারের বেশি হল মেয়েরা। এখানে ছেলেরা মেয়েদের কথা শোনে। ছেলেরা সংসারের যাবতীয় কাজ করে। এছাড়া, সামুদ্রিক মাছ শুকিয়ে ছেলেরা বেচাকেনা করে। ছেলেরা নৌকায় মাছ ধরে। এখানে আছে অজস্র নারিকেল গাছ। নারিকেলের ছোবড়ার নানা কাজ করে ছেলেরা। এখানে

টাকা পয়সা চলে না। সব কিছুই বেচাকেনা হয় দ্রব্যের বিনিময়ে। এমন দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

*

প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলে আছে বিন্দুর মতো ছোট ছোট দ্বীপ। এই দ্বীপের কাছে সমুদ্র উপকূলে আছে এক ধরণের মাছ—যে মাছ এই দ্বীপবাসীরা শিকার করে এনে রোদে শুকান, তারপর এই মাছের মুখে পুড়ে দেয় একটি শলতে। এই শলতে জ্বালালেই মোমবাতির মতো অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে আর আলো দেয়। এই মাছের দেহে আছে প্রচুর তেল। ফলে রোদে শুকিয়ে জ্বালালে জ্বলতে থাকে মোমবাতির মতো। তাই এই মাছকে বলা যেতে পারে মোমবাতি মাছ।

*

পাপুয়া নিউগিনি দ্বীপে আছে হরেক রকম পাখি। এখানে এক রকমের পাখি আছে যাদের মাথার দুপাশে আছে দুটি লম্বা পালক। রঙীন পালক—দেখে মনে হয় যেন দড়িতে পরপর নানা রঙের ছোট ছোট পতাকা ঝুলানো আছে। এই দেখতে অপরূপ পাখিকে তাই বলা হয় স্বর্গের পাখি। এমন সুন্দর পাখি আর কোথাও নেই। এই পাখির ইংরেজি নাম Bird of Paradisc.

*

আফ্রিকার বনে আছে এমন পাখি—যারা সাপ খেয়ে বাঁচে। বনের মধ্যে সাপ গর্ত থেকে বাইরে বের হলেই এই পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে ছোঁ মেরে ঠোঁটে করে সাপকে ধরে নিয়ে গাছে বসে খেয়ে

ফেলে। ঈগল পাখি সাপ খায়। ঈগল ছাড়াও আফ্রিকার এই পাখি সাপ খায়।

ডলফিন শুশুক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী। এই প্রাণী মানুষের গলার স্বর নকল করতে পারে, মানুষের মতো হাসতেও পারে। পৃথিবীর নানা সমুদ্রে ডলফিন আছে।

*

আফ্রিকার নদীতে এক ধরণের কুমির আছে যারা পাথর খায়। পেটের মধ্যে ভারী পাথর থাকায় কুমিরের জলে ডুবতে ও সাঁতার কাটতে সুবিধা হয়। তাই তারা পাথর খায়।

আমাদের দেশে পায়রা পাখি কাঁকর খায়। কাঁকর খেলে পায়রার হজমের সুবিধা হয়, তাই তারা কাঁকর বা ছোট পাথর খায়।

*

সুদান —আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ। এই দেশের রাজধানী খারতুম। এখানে আছে ব্লু-নীল ও হোয়াইট-নীল নামে দুটি নদীর সংযোগস্থল। এই সংযোগস্থল থেকে একই খাদে নদী প্রবাহিত কিন্তু পাশাপাশি দুই রঙের জল। দেখতে ভারী মজার।

*

কাশ্মীর—ভারতের উত্তর সীমান্তের রাজা। পাহাড়ে ঘেরা দেশ —অপরূপ সুন্দর। সারা পৃথিবী থেকে এখানে পর্যটকেরা আসেন— এখানকার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে। তাই কাশ্মীরকে বলা হয় ভূ-স্বর্গ।

*

অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকে ১২৫০ সাল লম্বা এক প্রবালের চর আছে।

এত বড় লম্বা প্রবাল কীটের চর অন্য কোথাও নেই। এই চরকে বলে গ্রেট বেরিয়ার রিফ (Great Barrier Reef)।

*

জালুইট দ্বীপ—প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। এখানে রোজ বৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে দুই-একদিন বন্ধ থাকে। দেখা গেছে যে বছরে গড়ে ২৩৬ দিন এই দ্বীপে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। তবে, ভারতের মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জীর মৌসিন রামগাঁওতে পরিমাণে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। আবার, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মাউন্ট ওয়েইয়ালিয়েলেও সবচেয়ে মুষলধারে সবচেয়ে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

সাবল দ্বীপ—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে তার অবস্থান। এই দ্বীপের কাছে আজ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো জাহাজ জলমগ্ন হয়েছে। তাই, এই দ্বীপের নানা নাম—হারানো জাহাজের দ্বীপ জাহাজের কবর দ্বীপ বলে। ইংরেজিতে এই দ্বীপের নাম—'Isle of Last ship' ও Graveyard of the Atlamtic' বলে।

*

বোটানি বে—অস্ট্রেলিয়ার কাছে এক উপসাগর। এই উপসাগরের তীরে দ্বীপপুঞ্জে বহু জানা-অজানা গাছগাছালি-লতাপাতা আর ফুলফলের গাছ আছে। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা এখানে অনুসন্ধানে আসেন, এসেছেন অভিযাত্রীরাও। বিখ্যাত অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন কুক এই উপসাগরের নাম বোটানি বে দিয়েছিলেন।

*

ভারতের তামিলাড়ু রাজ্যের (পূর্বতন মাদ্রাজের) নীলগিরি পর্বতের উপত্যকা অঞ্চলে বাস পাহাড়ী আদিবাসী উপজাতি টোডা। বিশাল বলিষ্ঠ দেহী, তাদের মুখে দাড়িও গোঁপ। চুলও ঝাঁকড়া।

তারা পশুপালন করে। মেয়েরা উলকি কাটে কারা দেহে। মৃতদেহ দাহ করে তবে তার সঙ্গে মোষ বলি দেয়। তারা ভূত প্রেত ডাকিনীতে বিশ্বাস করে। তাদের দেবীর নাম—টিয়েক জ্রি। তাদের ঘরবাড়ি খুব সুন্দর।

*

দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের কোলঘেঁষা দেশ—ইকোয়েডর। এই দেশেই আছে পৃথিবীর সবচেয়ে পাখি। তার নাম হামিং বার্ড। খুব ছোট পাখি কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর।

*

দক্ষিণ আমেরিকার বনে এক ধরণের সাপ আছে যারা যখন চলে তখন ঝুমঝুম শব্দ হয়। বিষধর সাপ। কামড়ালে আর রক্ষা নেই। এই সাপকে বলে রাটের।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের জঙ্গল এক ধরণের পাখি আছে—তাদের গলার স্বর অনেকটা কুকুরের মতো। গাছে এই পাখি যখন ডাকে তখন অনেকের মনে হবে যেন কুকুর ডাকছে। এই পাখিকে বলে গুইড-গুইড (Guid-Guid)।

*

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে আমাজন নদীর তীরে গভীর বনাঞ্চলে বিরাট আকারের মাকড়সা আছে। এই মাকড়সা বনের ছোট ছোট পাখি, ইঁদুর, গিরগিটি ধরে খায়।

*

উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের কাছে আটলানটিক মহাসাগরে আছে দুই মাথা যুক্ত তিমি।

*

ভেনিস—ইউরোপ মহাদেশের ইটালী দেশের নগর। এই নগরে সড়কপথ নেই। তার বদলে আছে খাল। এই খালই সড়কের কাজ করে। পৃথিবীতে এমন শহর অন্যত্র কোথাও নেই।

*

চীন-পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে এই দেশে। এদেশেই আছে পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাচীর। এই প্রাচীর ছিল ২৫৫০ মাইল দীর্ঘ। প্রাচীরের উচ্চতা ১৫ থেকে ৩০ ফুট। প্রাচীরের গোড়ার প্রস্থ ২৫ ফুট উপরের প্রাচীর ৫ ফুট। অবশ্য বর্তমানে এই প্রাচীরকে অনেক ছোট করা হয়েছে।

*

উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাজ্যের ক্যালিফোর্ণিয়ার সিকোইয়া ন্যাশন্যাল পার্কের রেড উড গাছটি হল পৃথিবীর বৃহত্তম বৃক্ষ। এই গাছ ২৭২ ফুট ৪ ইঞ্চি উঁচু এবং গোড়ার ব্যাস ১০১ ফুট ৭ ইঞ্চি। আবার কালিফোর্ণিয়ার হামবোল্ড কান্ট্রির হাওয়ার্ড লিরবে গাছটি হল পৃথিবীর উচ্চতম। এই গাছের উচ্চতা হল ৩৮৫ ফুট।

*

ইন্দোনেশিয়া হল পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জের দেশ। ইন্দোনেশিয়া কোনও সংযুক্ত ভূখণ্ড নয়। পশ্চিমে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে। তার মাঝখানে আছে প্রায় তিন হাজার ছোট-বড়-মাঝারি দ্বীপপুঞ্জ, এই তিন হাজার দ্বীপপুঞ্জ মিলিয়েই হল ইন্দোনেশিয়া দেশ।

*

পৃথিবীর নানা দেশের নানা ভৌগোলিক উপনাম আছে। এই নামগুলি বেশ মজার।

পারসীয়ান উপসাগরে অবস্থিত বাহেরিন দ্বীপকে বলা হয় মুক্তাদ্বীপ (Island of Pearls)।

মধ্য আটলান্টিকের ত্রিস্তান-দা-কুনহা দ্বীপকে বলা হয় পৃথিবীর নির্জনতম দ্বীপ (Loneliest Island of the world)।

শুধু তিব্বতকে নয়, পামীরকেও বলা হয় পৃথিবীর ছাদ (Roof of the world)।

প্যালেসটাইনকে বলা হয় পৃথিবীর পবিত্রভূমি (Holy Land of the world)।

কিউবাকে বলা হয় পৃথিবীর চিনির পাত্র (Sugar Bowl of the world)।

জাঞ্জিবার দ্বীপকে বলা হয় লবঙ্গ হ্রদ (Island of cloves)।

তিব্বতের রাজধানী লাসাকে বলা হয় পৃথিবীর নিষিদ্ধ নগরী (Forbidden city of the world)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইরর্ক নগরীরর নানা উপনাম। এই নগরীকে বলা হয় সাম্রাজ্যনগরী (Emprie City)। এখানেই আছে পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা—এমপায়ার স্টেট বিলডিং। ১০২ তলা বিশিষ্ট এই বাড়ির উচ্চতা ১২৫০ ফুট। এই বাড়ির ৮৬ তলা থেকে চারপাশেই ২৫ মাইল দূরবর্তী দৃশ্যই দেখা যায়। ১৯১১ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু এই বাড়িটি নির্মিত হয়। নিউইয়র্কের গ্র্যাণ্ড সেণ্টাল টার্মিনাল রেলস্টেশন হল পৃথিবীর বৃহত্তম রেলস্টেশন, এখানে ৪৭টি প্ল্যাটফর্ম আছে। নিউইয়র্কে আছে অনেক সুউচ্চ অট্টালিকা।

তাই নিউইয়র্কে বলা হয় আকাশ ছোঁয়া গগনচুম্বী নগরী (City of sky Scrappers)। আবার, নিউইয়র্ক হল পৃথিবীর দীর্ঘতম বন্দর। নিউইয়র্ক বন্দরের পোতাশ্রয়ের মুখে বেডলোর দ্বীপে আছে ব্রোঞ্জ নির্মিত আলোক বর্তিকা ধারিনী সুবিশাল নারী মূর্তির অপরূপ ভাস্কর্য-তাকে বলা হয় স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি (Statue of Liberty)। আমেরিকার স্বাধীনতার শতবার্ষিকী স্মারক এই ভাস্কর্য নির্মাণ করেন ফরাসী সরকার। পাদপীঠ সমেত মূর্তিটির উচ্চতা ৩০৫ ফুট, মূর্তিটি ১৫১ ফুট উঁচু।

যবদ্বীপ-জাভাকে বলা হয় বজ্রপাতের দেশ। কারণ এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়।

উত্তর আমেরিকার মেকসিকোকে বলা হয় সোনার দেশ। কারণ, এখানে সবচেয়ে বেশি সোনা পাওয়া যায়।

কানাডার মনট্রিল শহরকে বলা হয় ঘড়িঘরের দেশ। এখানেই আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘডিঘর।

পোলাণ্ডের ক্রাকো-কে বলা হয় লবনের দেশ। এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লবনের খনি আছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কিমবারলি-কে বলা হয় হীরকখনির দেশ। এখানে আছে পৃথিবীর বৃহতম হীরক খনি।

সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশকে বলা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ (Dark Continent).

জাপানের রাজধানী টোকিও-কে বলা হয় ঘনবসতির শহর। এই শহর হল পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর। বর্তমানে এই শহরের জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি।

আমেরিকার সানফ্রানসিসকো শহরকে বলা হয় স্বর্ণদ্বার (City of Golden Gate)।

ইটালীর ভেনিসকে বলা হয় আদরিয়াতিকের রাণী (Queen of the Adrirtic)।

ইংল্যাণ্ডের কেণ্ট শহরকে বলা হয় ইংল্যাণ্ডের উদ্যান (Garden of England)।

স্কটল্যাণ্ডকে বলা হয় পিণ্ডনগরী (Land of cakes)।

ফিনল্যাণ্ডকে বলা হয় সহস্র হ্রদের দেশ (Land of thousand Lakes)।

অস্ট্রেলিয়াকে বলা হয় সোনার ভেড়ার লোমের দেশ (Land of Golden Fleece)।

আয়ারল্যাণ্ডকে বলা হয় পান্নার দ্বীপ (Emerald Isle)।

কানাডাকে বলা হয় ম্যাপলবৃক্ষের দেশ (Land of Maple)।

অ্যাবাডিনাজকে বলা হয় গ্রানাইট পাথরের দেশ Granite City)।

রোম-কে বলা হয় স্বর্গপুরী (Eternal City)। রোম-কে সাত পাহাড়ের নগরীও বলা হয় (City of Seven Hills)।

মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান (Gift of the Nile)।

সুইজারল্যাণ্ডকে বলা হয় ইউরোপের ক্রীড়াভূমি (Playgrund of Europe)।

জাপানকে বলা হয় উদীয়মান সূর্যের দেশ (Land of the Rising Sun)।

নরওয়ে-কে বলা হয় মধ্যরাত্রির সূর্যের দেশ (Land of Midnight Sun)।

কোরিয়া (উত্তর ও দক্ষিণ সংযুক্ত দেশ)-কে বলা হয় ভোরের নীরবতার দেশ (Land of tne Morning Calm)। কোরিয়া-কে বলা হয় সন্ন্যাসীরাজ্য (Hormit Kingdom)।

স্টকহোমকে বলা হয় উত্তরের ভেনিস (Venice of the North)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরকে বলা হয় ঝড়ের নগর (Windy City)।

আফ্রিকা মহাদেশের গিনি কোস্টকে বলা হয় শ্বেতাঙ্গদের কবরের দেশ (Land of Whiteman's Grave)।

ভারতের রাজস্থানের জয়পুরকে বলা হয় গোলাপী রঙের শহর (Rose-Pink City)।

জিব্রালটারকে বলা হয় ভূমধ্যসাগরের চাবি (Key of the Mediterranean)।

মালাক্কাস দ্বীপপুঞ্জকে মসলার দ্বীপ (The Spices Island) খাদ্য সুগন্ধ ও সুস্বাদু করবার উপকরণ মসলা এই দ্বীপে উৎপন্ন হয়।

অস্ট্রেলিয়ার কুইনল্যাণ্ড প্রদেশের একটি শহরকে বলা হয় নেভার-নেভার ল্যাণ্ড (Never-Never Land)।

হল্যাণ্ডের তীরবর্তী একটি উপসাগরের নাম জুইইডার জী (Zuyder Zee)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গ রাজ্যের নাম দি নিউ ইংল্যাণ্ড (The New England)।

বাংলাদেশকে বলা হয় সোনালী আঁশের দেশ। এখানে সোনালী রঙের পাট উৎপন্ন হয়।

থাইল্যাণ্ড (শ্যাম)-কে বলা হয় শ্বেতহস্তীর দেশ। এখানে সাদা রঙের হাতী আছে।

মিশরের কায়রোকে বলা হয় বাজারের শহর।

ইস্‌তামবুলকে বলা হয় সোনার অন্তঃপুর।

চীনকে বলা হয় নানা খাবারের দেশ। সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি রকমের খাবার চীনের অধিবাসীরাই খায়। চীনের লোকেরা সোয়ালো পাখির বাসা খায়। অবশ্য ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীরাও এই পাখির বাসা খায়।

*　　*　　*

আজব দুনিয়ায় এমন একটি দেশ যেখানে সমাধির জন্য মাটির নিচে আছে বিশাল প্রাসাদ। ভূ-গর্ভস্থ এই সমাধিক্ষেত্রের নাম ক্যাটাকোম (Cata comb)। মিশরের বন্দরনগর আলেকজান্দ্রিয়ায় এই সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত, সেখানকার রাজ পরিবারেরর মৃতদের এখানে সমাধিস্থ করা হয়। এই বন্দরের মুখে ফ্যারোস দ্বীপে ছিল শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত পৃথিবীবিখ্যাত বাতঘর, অবশ্য নেই।

*　　*　　*

স্তম্ভ বা মিনার খাড়াইভাবে উপরে উঠে যায়। কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি মিনার আছে যেটি হেলানো। ইটালী দেশের পিসা নগরীতে শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত এই মিজার ভূপৃষ্ঠের উপর লম্বভাবে দাঁড়িয়ে নেই, একদিকে ১৪ ফিট হেলে আছে।

*　　*　　*

শূন্যে উদ্যান—মাটি থেকে ৩০০ ফিট উঁচুতে ঝুলানো উদ্যান।

বাগদাদের দক্ষিণে ইউফ্রেটিস নদীর কাছে ব্যাবিলনে অবস্থিত এই শূন্যোদ্যান রাজা নেবুকাডনেজার নির্মাণ করেন।

* * *

পৃথিবীয় বিস্ময়—মিশরের পিরামিড আর স্ফিংস। মিশরের নীল নদের পশ্চিম তীরে ঘিজের দক্ষিণে পিরামিডগুলি অবস্থিত। প্রাই ৬০ মাইল এলাকায় পিরামিডগুলি আছে। এগুলি নানা উচ্চতার, সর্বোচ্চ পিরামিডের উচ্চতা ছিল ৪৮২ ফুট খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০০ থেকে ৩৫০০ হাজার পূর্বে পিরামিডগুলি নির্মিত।

স্ফিংসও এখানেই অবস্থিত। স্ফিংস হল প্রস্তর নির্মিত নরমুণ্ড-বিশিষ্ট অর্ধসিংহের বিশাল মূর্তি। ফ্যারাও-রা এগুলি নির্মাণ করেন।

* * *

আমাদের দেশের পাখি ছোট্ট টুনটুনি সুন্দর বাসা বানিয়ে বাস করে। তেমনি বাবুই পাখির বাসাও সুন্দর। অস্ট্রেলিয়ার আছে রাওয়ার বার্ড। তারা লতাপাতা দিয়ে অতি সুন্দর বাসা বানায়। তাই এই পাখিকে বলে লতাকুঞ্জ পাখি। এই পাখি রঙীন জিনিস ভালবাসে। তাদের বাসায় সাজানো থাকে ভাঙ্গা কাঁচ, পাথর, কাগজ আর কাপড়।

* * *

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত কেজারী দ্বীপ এই দ্বীপে আছে লরেল গাছ। এই গাছ থেকে এমন শব্দ বের হয়, যেন মনে হয় যে এই গাছ কাঁদছে।

রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটক আমাদের অজানা নয়। তাসেদের কিন্তু দেশ আছে। অর্থাৎ তাসে আছে সাহেব-বিবি-গোলাম। তাসের বুকে আছে নানা রঙের সাহেব-বিবি-গোলামের ছবি। কিন্তু

তারা কেউই কাল্পনিক সাহেব-বিবি-গোলাম নয়। তারা প্রত্যেকেই এক একজন ইতিহাসখ্যাত সাহেব-বিবি-গোলাম। তাঁদের প্রতিকৃতিই তাসের বুকে আঁকা আছে।

আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর আগে তাস খেলার প্রচলন হয় বলে শোনা যায়। মূরের স্পেন দেশে তাস খেলা প্রবর্তন করেন। পরের ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রচলিত হয়। এখন অবশ্য তাসখেলা পৃথিবীর নানা দেশের জনপ্রিয় খেলা।

তাসের সাহেব হল রাজা, বিবি হল রাণী আর গোলাম হল ক্রীত-দাস বা ক্রীত আজ্ঞাবহ দাস।

তাদের আসল পরিচয় হল :

হরতন :

হরতনের সাহেব হলেন ইতিহাসখ্যাত ফরাসী সম্রাট শারলেম্যান।

হরতনের বিবি হলেন রাণী জুবিথ।

হরতনের গোলাম হলেন জন অফ আর্কের সৈনিক বন্ধু।

রুইতন :

রুইতনের সাহেব হলেন জুলিয়াস সীজার।

রুইতনের বিবি হলেন হলেন পৌরাণিক কাহিনীর ইহুদী অপরূপা সুন্দরী র‍্যাসেল।

রুইতনের গোলাম হলেন পৌরাণিক কাহিনীর পুরুষ রোল্যাণ্ড।

ইসকাপন :

ইসকাপাপনের সাহেব হলেন ডেভিড।

ইসকাপনের বিবি হলেন গ্রীকপুরাণ কাহিনীর দেবী মিনার্ভা।

ইসকাপনের গোলাম হলেন ডেনমারকের ইতিহাসখ্যাত রাজা হোজিয়ার।

চিরাতন :

চিরাতনের সাহেব হলেন গ্রীকবীর সম্রাট আলেকজাণ্ডার।

চিরাতনের বিবি হলেন রাণী এলিজাবেথ।

চিরাতনের গোলাম হলেন আরথারের নাইট লানসিলট।

সর্বশেষ সংবাদ :

গত ৩০ নভেম্বর ১৯৮৫ ভারতের গোয়ার পানাজী নৌবন্দর থেকে ৮৫ জন ভারতীয় অভিযাত্রীকে নিয়ে পঞ্চম ভারতীয় অভিযাত্রীচল কুমেরু অভিমুখে পাড়ি দিয়েছেন সুইডেনে নির্মিত আইস ব্রেকার মূলে ল্যাণ্ড জাহাজে। এই পঞ্চম অভিযাত্রীদল কুমেরুতে চারমাস অবস্থান করবেন। অভিযাত্রীদলের নেতা এম. কে. কাউল পানাজীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আশা প্রকাশ করে বলেছেন যে এই অভিযান সফল হবে। এই অভিযাত্রীদলের দুজন মহিলা সদস্যা আছেন এবং প্রথম থেকে চতুর্থ অভিযান পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী নয়জন সদস্য আছেন।

—শেষ—

